যে বৃক্ষরাজির ছায়ায় বেড়ে উঠি

# আমার আব্বা আম্মা

সাইয়েদা হুমায়রা মওদূদী

www.pathagar.com

যে বৃক্ষরাজির ছায়ায় বেড়ে উঠি

# আমার আব্বা আম্মা

(সাইয়েদ মওদূদী র. ও বেগম মওদূদী র.-এর অনবদ্য জীবনালেখ্য)


সাইয়েদা হুমায়রা মওদূদী

অনুবাদ ও সম্পাদনা

সাইয়েদ রাকে সামনান



আধুনিক প্রকাশনী

ঢাকা



www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪
ISBN : 984-619-056-9

স্বত্ব ঃ খুররম একাডেমী, ঢাকা।

আঃ প্রঃ ৪১১

৬ষ্ঠ প্রকাশ (আধুঃ ১ম)

| | |
|---|---|
| সফর | ১৪৩১ |
| মাঘ | ১৪১৬ |
| জানুয়ারী | ২০১০ |

বিনিময় ঃ ৮০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

---

AMAR ABBA AMMA by Sayiida Humayera Moududi. Translated by Saiyed Rafe Samnan Published by Adhunik Prokashani, 25, Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25, Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Price : Taka 80.00 Only.

www.pathagar.com

www.pathagar.com

# -ঃ সূচীপত্র ঃ -


| | |
|---|---|
| ভূমিকা | ৯ |
| অনুবাদকের নিবেদন | ১১ |
| আলহামদুলিল্লাহ | ১৩ |
| শিক্ষাজীবন ও ওস্তাদগণ | ১৫ |
| আল জিহাদ ফিল ইসলাম রচনা | ১৮ |
| মহাকবি ইকবাল হিজরত আল জিহাদ | ২০ |
| আম্মার দেখা স্বপ্ন | ২৩ |
| দারুল ইসলাম পাঠানকোর্টে | ২৫ |
| দেশ বিভাগ : আগস্ট ১৯৪৭ | ২৯ |
| সোহান লাল কলেজ ভবন, লাহোর:১৯৪৭ সাল | ৩২ |
| কারাবরণের সূচনা : আম্মার ধৈর্য ও দাদীর শিক্ষা | ৪০ |
| আবার কারান্তরালে : এবার সামরিক আইনে | ৪৫ |
| স্মরণীয় দিন–বিভীষিকাময় রাত | ৪৭ |
| কারাগারের সাতকাহন | ৫৬ |
| কারাগারে ঈদের দিনে | ৫৯ |
| জেনারেল আকবর খানের সাথে কথাবার্তা | ৬২ |
| গবেষণা কর্ম : ভাই, পরিজন, সমাজ, দল ও জীবন | ৬৪ |
| সাইয়েদের সাত বৈশিষ্ট্য | ৬৯ |
| ফিলিস্তিনী প্রতিনিধি দলের আগমন ও আপ্যায়ন | ৭২ |
| দাদীর বিদায় ও ইছালে সওয়াব | ৭৪ |
| তৃতীয়বার কারাবরণ : ৬ জানুয়ারী ১৯৬৪ | ৭৫ |
| সামরিক সরকারের একটি হীন ষড়যন্ত্র : ১৯৬৬ সালের রমযান | ৭৮ |
| কলেজ জীবনের কথা | ৮০ |
| লুকিয়ে লুকিয়ে পাণ্ডুলিপি পাঠ | ৮২ |
| তাফসীর লিখতে লিখতে এই তো উঠে গেলেন | ৮৪ |
| নাতনীর সাথে কথোপকথন | ৮৫ |
| আমার অনুপম আদর্শ | ৮৬ |
| জুন ১৯৭২ তাফহীমুল কুরআনের প্রকাশনা উৎসবে | ৮৮ |
| এপ্রিল ১৯৭৭ সাল : দেখা করতে আসলেন প্রধানমন্ত্রী ভূট্টো | ৯০ |
| রাজা বাদশাহদের সাথে সম্পর্ক | ৯২ |
| বাদশাহ ফয়সালকে একটি পরামর্শ | ৯৪ |


www.pathagar.com

একটি স্বপ্নের তা'বীর ৯৭
অসুস্থতার ব্যাপ্তি ১০১
বাফেলো যুক্তরাষ্ট্র : সেপ্টেম্বর ১৯৭৯ : ১০৩
জন এফ কেনেডী বিমানবন্দরে ১০৫
আম্মাকে নিয়ে মক্কা মদীনায় ১০৭
আম্মা সম্পর্কে আব্বা ১১১
শেষ দিনগুলোতে ১১৪

www.pathagar.com

# ভূমিকা

আব্বা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. মুসলিম উম্মাহর এক বিশাল সম্পদ, তাই তাঁর স্মরণ ও স্মারক উম্মাহর জন্য আমানত স্বরূপ। তাঁকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য ২০০৪ সালের মে মাসে লাহোর থেকে প্রকাশিত মাসিক সাময়িকী তারজুমানুল কুরআনের' একটি বিশেষ সংখ্যায় আমার একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। সেখানে আমি কিছু স্মৃতিচারণ করেছিলাম, আব্বার জন্মশত বার্ষিকীতে তাঁকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য।

অপরকে ধৈর্যধারণের উপদেশ দেয়া খুব সহজ, কিন্তু নিজে ধৈর্যধারণ করা অত্যন্ত কঠিন। সবরের ঢোক সবচাইতে তিক্ত ঢোক, যা হজম করা সত্যিই কঠিন। অথচ আমি জিন্দেগীভর দাদী, আব্বা ও আম্মাকে বিন্দু বিন্দু করে সবরের তিক্ত স্বাদ হজম করতে দেখেছি। সারা জীবন তাঁরা ধৈর্যের যে পরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে গেছেন এ কাহিনী তারই প্রতিচ্ছবি। বার বার অশ্রু সজল হয়ে উঠতো দৃষ্টি ; ভরা পানপাত্রের মতো অশ্রু জমে থাকতো অক্ষি কোটরে, ঝরে পড়েনি দৃষ্টিমানের সামনে। হয়তো বা শত দুঃখ কষ্টের মাঝেও অশ্রুগুলো ঝরতে পারেনি। কারণ দাদী বলে দিয়েছিলেন, "ক্রন্দনরত ব্যক্তির সাথে কেউ কাঁদে না, কিন্তু যে হাসিখুশী তার সাথে সবাই হাসে। সকলে ক্রন্দনরত ব্যক্তির তামাশা দেখে।"

আজ বলা হয় বিগত শতাব্দী ছিল মাওলানা মওদূদীর শতাব্দী। তিনি নিজ ক্ষুরধার লেখনী দ্বারা চিন্তার রাজ্যে এক ব্যাপক বিপ্লব সাধন করেন। বিশ্ব ইসলামী আন্দোলন আজ তাঁর লেখনী ও সাহিত্য দ্বারা দারুণভাবে উপকৃত হচ্ছে। তবে এখানে স্মর্তব্য যে, কোনো চিন্তাবিদ বা লেখকের মহান সৃষ্টিসমূহ তখন সম্ভব যখন তার পরিবেশ ও প্রতিবেশ অনুকূল থাকে। পরিবারের সদস্যদের অটুট সহযোগিতা সে লাভ করে, বিশেষ করে সহধর্মিনীর সহযোগিতা ও শান্তিপূর্ণ সান্নিধ্য।

এটা শুধুমাত্র একটি স্মৃতিচারণ নয় বরং এক খ্যাতিমান ব্যক্তি, তাঁর স্নেহময়ী জননী ও জীবন-সংগিনীর ধৈর্য ও দৃঢ়তার অনবদ্য আলেখ্য। আজ বিশ্বময় বিস্তৃত মহান এ ইসলামী আন্দোলন এমন একটি গৃহকোণ থেকে সূচিত হয়েছিল যে পরিবারে ছিল শিশু-কিশোর নয়জন সন্তান, 'মা' ছিলেন, আর ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল স্বাস্থ্য হাঁপানির রোগী জীবনসংগিনী। সেই পরিবারের সদস্যরা যদি গাফিলতি করতো কিংবা কোনো বিষয়ে অধৈর্যের পরিচয় দিতো তাহলে আজ আমরা আন্দোলনের যে সাজানো

www.pathagar.com

বাগান দেখছি, তা হয়তো এমন হতো না। আন্দোলন-সংগঠনের সাথে নেতা-কর্মীর সম্পর্ক আসলে মানুষের আচরণ দ্বারা নির্ধারিত হয়। এ জন্যই কারো স্থান হয় প্রথম সারিতে, আর কারো অবস্থান হয় শেষের সারিতে। অনেকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে না গিয়ে ঘরে বসেই নিজেদের ভূমিকা পালন করেন। এজন্যই এ কাহিনী সারা জীবনের ধৈর্য, ত্যাগ-তিতিক্ষা, কুরবানী, স্বার্থত্যাগ ও আত্মত্যাগের এক মহান জীবনকাহিনী।

পর্দা সরিয়ে 'এই ঘরের' এক ঝলক পাঠকের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে যেন পাঠক একটু বুঝতে পারেন। ঝড়-তুফান আর ডামাডোলের ধাক্কার পরও কেমন করে চলতো সেই ঘর সেই সংসার।

*"কেয়া গুজাররতি হ্যায় কাতরে পে গোহর হোনে তাক"*

*অর্থ : 'মিশে যাবার পূর্বে অঝরা অশ্রুবিন্দুর কি অবস্থা হতো।'*

সাময়িকী পত্রের নিবন্ধের সীমাবদ্ধতার কারণে "শাজার হায়ে ছায়েদার" (দাদী, আব্বাজান ও আম্মা) তথা 'যে বৃক্ষরাজির ছায়ায় বেড়ে উঠি'–সম্বন্ধে বেশী কিছু লিখতে পারলাম না। কিছু সংযোজনের পর পুস্তক আকারে আমার কাছে দেয়ার পর আবার দেখে দিয়েছি। আশা করি পুস্তিকার পাতার পরতে পরতে পাঠকের হৃদয়ে সেই মহান ব্যক্তিদের জীবন আরও স্পষ্টতর হতে থাকবে যাদের জীবনী নিয়ে এ আলেখ্য।

**হুমায়রা মওদূদী**
লাহোর
পাকিস্তান

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

# অনুবাদকের নিবেদন

"নিশ্চয়ই আকাশ ও পৃথিবীর সৃজনে আর রাত-দিনের ক্রমাবর্তনে সে সকল বুদ্ধিমান লোকদের জন্য অসংখ্য নিদর্শন বিদ্যমান।"–সূরা আলে ইমরান : ১৯০।

মুমিন জননী হযরত আয়েশা রা. বলেন : একদিন ফযরের নামাযের আযান দিতে এসে হযরত বিলাল রা. দেখতে পেলেন আল্লাহর রাসূল সা. কাঁদছেন। হযরত বেলাল রা. বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ সা.! আপনার ক্রন্দনের কারণ কি? রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, কারণ আজ রাতে আমার উপর (اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ)" আয়াতের শেষতক ; (আলে ইমরান : ১৯০) নাযিল হয়েছে। এরপর তিনি সা. বললেন : কপাল খারাপ সেই ব্যক্তির যে এ আয়াত পড়লো কিন্তু এ কারিগরি ও নির্দশন নিয়ে চিন্তা করলো না। আল্ ইতক্বান, (আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতী গ্রন্থে) ইবনে হাব্বান, ইবনে মুনজির, ইবনে মারদুইয়া ও ইবনে আবিদ দুনিয়ার সূত্রে বর্ণিত।

শুরুতেই পাঠক সমাজের নিকট নিবেদন চিন্তাশীল অন্তর নিয়ে বইটি পড়বেন। নেহায়েত খেয়াল-খুশি, আবেগ আর উচ্ছ্বাসের ভাবাবেগ নিয়েও বইটি আদ্যপান্ত পড়া হয়ে গেছে অনেকের "সাপ্তাহিক সোনার বাংলার" পাতায় ; আর এ গ্রন্থটিও পড়া হয়ে যাবে হয়তো। জীবনীগ্রন্থ পাঠের সবচেয়ে বেশী উপকার লাভ করেন সেই পাঠক যিনি পঠিত জীবনের শিক্ষা নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারেন।

এবার পুস্তকটির নাম নিয়ে কথা মূল উর্দূ নাম "হামারে ওয়ালেদীন : শাজার হায়ে ছায়েদার" বাংলায় অর্থ হলো "আমাদের বাবা মা যেন ছায়া সুনিবীড় বৃক্ষ"। পুস্তকটির বাংলা অনুবাদ সাপ্তাহিক সোনার বাংলায় "আমার আব্বা আম্মা" শীর্ষক নিবন্ধ আকারে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে ২৯ জুলাই ২০০৫ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৫ পর্যন্ত নিয়মিত ১০টি কিস্তিতে। এ জীবনী গ্রন্থে আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.-এর সম্মানিতা মা-এর চরিত্র যেন নিউক্লিয়াসের মতো। এ পুস্তকে আমরা দেখতে পাই নাতি-নাতনীদের চরিত্র গঠনে একজন দাদীকে, পুত্রবধুর সাথে জীবন সংগ্রামে সহযোদ্ধা এক শাশুড়ীকে, সন্তানদের জন্ম থেকে আজীবন সুখ-দুঃখ-বেদনার অকৃত্রিম নিঃস্বার্থ সাথী এক আদর্শ জননীকে– রাব্বির হামহুমা

www.pathagar.com

কামা রাব্বাইয়ানী সাগীরা। এজন্যই আমরা এ পুস্তকটির নাম রাখলাম "যে বৃক্ষরাজির ছায়ায় বেড়ে উঠি : আমার আব্বা আম্মা।" যে বৃক্ষরাজির ছায়ায় বেড়ে উঠি : আমার আব্বা আম্মা" পুস্তকটি একটি স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ। এর প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হলো মা-বাবার জীবনকাহিনী নিয়ে স্নেহাস্পদ কন্যার প্রাণবন্ত আলোচনা। লেখক চিন্তাবিদরা আল্লামা মওদূদী র.-এর জীবনী নিয়ে অনেক কিছু লিখেছেন। সে ধরনের লেখা আমরা অনেক দেখেছি ও পড়েছি। গ্রন্থটি সে ধরনের কোনো নিয়মতান্ত্রিক গবেষণা ধর্মী বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধ নিবন্ধের সমাবেশ নয়। তিন ব্যক্তিত্বের জীবনের নানা ঘটনা একজনের লেখনীতে বেড়ে উঠেছে, মা-বাবা-দাদী এরাই তো মানব সন্তানের জীবনের আজীবন ছায়া। তাদের স্নিগ্ধ ছায়ায় বেড়ে উঠা লেখিকার জীবনের আত্মকাহিনীও যেন প্রক্ষিপ্ত এ গ্রন্থে।

এ গ্রন্থের কাহিনী বর্ণনা অন্য যেকোনো জীবনীগ্রন্থ থেকে ভিন্ন শুধু এ কারণেই নয় যে এটি প্রত্যক্ষদর্শীর ধারা বর্ণনা। বরং তার চেয়েও যেন আরো বেশী জীবন্ত। বাবা মায়ের স্মৃতিকথা যখন তাদেরই আদরের কন্যার লেখনিতে ফুটে ওঠে তখন স্বাভাবিকভাবেই অন্যান্য ধারাবিবরণী থেকে অনেক অনেক বেশী জীবন্ত হয়ে ওঠে। আর এ গ্রন্থের স্বার্থকতা এখানেই।

সাইয়েদ রাফে সামনান
৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৫
ঢাকা

www.pathagar.com

# আল্‌হামদুলিল্লাহ

আল্লাহ্‌ পাক যখন কোনো বান্দাকে দিয়ে কোনো বিশেষ কাজ করাতে চান তখন তার জীবনের বীণা বাধা হয়ে পড়ে ভিন্ন তারে। যে তারে সাধারণ সুর ধ্বনি তোলে না, অনুরণিত হয় অসাধারণ সুরেলা কণ্ঠস্বর। এই দূরের কণ্ঠস্বর সুদূর থেকে অদূর ভবিষ্যতের কার্যক্রম কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে পারে।

বিগত তের-চৌদ্দ শত বছর যাবত দুনিয়ায় ইসলামী তাবলীগ, দীনি শিক্ষা-দীক্ষা এবং পীর-মুরশিদী কাজ অব্যাহতভাবে করে যাচ্ছে এমন এক অতি সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন আমার আব্বাজান। তিনি হলেন আহলে বাইতের একটি সুপ্রসিদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত শাখার সন্তান। যারা আরব থেকে প্রথম আফগানিস্তানের হেরাত এবং পরবর্তীতে কুতুবুদ্দিন মওদূদ চিশতী রহ.-এর (১০৩৯-১১৩৩ হিজরী) জমানায় ভারতবর্ষে হিজরত করেন। সাইয়েদ কুতুবুদ্দিন রহ. ভারতীয় চিশতীয়া তরিকতের সবচেয়ে বড় বুযুর্গানেদীন হিসেবে পরিচিত ছিলেন। এ তরিকত কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণের বিশেষ আয়োজন করতো।

আমার দাদাজান সাইয়েদ আহমদ হাসান (১৮৫৫-১৯২০) পেশায় ছিলেন উকিল। ইবাদাত ও কৃচ্ছ্রসাধন জিন্দেগী যাপনের কারণে ওকালতিতে তিনি বেশী সময় দিতে পারতেন না। তাছাড়া মিথ্যা বা অন্যায়ের পক্ষে 'কেস' গ্রহণ করতেন না।

দাদাজানের জীবনের এ পর্যায়ে ভারতের দাক্ষিণাত্যের (বর্তমান মহারাষ্ট্র) আওরঙ্গাবাদে ১৯০৩ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর আব্বাজান জন্মগ্রহণ করেন। নিতান্তই দীনি পরিবেশে বেড়ে উঠেন আব্বাজান। শৈশবেই দাদা তাকে সাথে করে মসজিদে নিয়ে যেতেন। নিজের বন্ধু আলেম-ওলামাদের বৈঠকে সাথে নিয়ে বসতেন। কুরআনের ছোট ছোট সূরাসমূহ মুখস্ত করাতেন। আরবী ও উচ্চাঙ্গের উর্দু শিক্ষার প্রথম শিক্ষক ছিলেন দাদাজান। এ জন্যই দাদাজানের চরিত্রের একটি বিশাল প্রভাব আমরা আব্বাজানের জীবনে লক্ষ করি।

সন্ধ্যার পর দাদাজান আব্বাকে নিয়ে বসতেন গল্প শোনানোর জন্য। আম্বিয়াগণের আ. কিস্‌সা-কাহিনী, বুযুর্গানেদীনের জীবনী ও ইসলামের ইতিহাসের নানা মজাদার গল্প শিশু পুত্রের কোমল প্রাণে গেঁথে দিয়েছিলেন দাদাজান। তাছাড়া ইসলামী আকায়েদ, অন্যান্য দীনি বিষয়ে সুন্দর করে শৈশবেই আব্বার প্রশিক্ষণ হয়ে যায়। চরিত্র সংশোধনের ক্ষেত্রেও তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন।

www.pathagar.com

উর্দু ভাষা সঠিকভাবে বলার বিষয়টি তিনি অধিক গুরুত্ব সহকারে দেখতেন। কারণ ভাষা শিক্ষার জন্য শৈশবকালই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আব্বাজান বলতেন, তোমার দাদা যদি আমার মধ্যে কোনো দোষ দেখতেন তাহলে তা তাৎক্ষণিক দূর করার চেষ্টা করতেন এবং আমাকে দোষমুক্ত না করা পর্যন্ত ক্ষান্ত হতেন না। ছেলেবেলায় একদিন আমি আমাদের পরিচারিকার সন্তানকে মেরেছিলাম। এটা শুনে তিনি সেই গৃহ পরিচারিকার ছেলেকে ডাকলেন এবং বললেন, যেভাবে সে তোমাকে মেরেছে, সেভাবেই তুমি তাকে মার। এ ঘটনা আমার জীবনে এমন এক শিক্ষার কাজ করেছে, যার ফলে জীবনে কখনো কোনো অধস্তন ভৃত্য বা কর্মচারীর ওপর আমি আর হাত তুলিনি।

* * *

www.pathagar.com

## শিক্ষা জীবন ও ওস্তাদগণ

মাদ্‌রাসায় প্রেরণের পূর্বে গৃহের চার দেয়ালের মধ্যেই তার শিক্ষা জীবন শুরু হয়। এ বিষয়ে আব্বাজান লিখেন, "আমার সম্পর্ক এমন এক দীনি খান্দানের সাথে যারা ১৩০০ বছর ধরে সিলসিলায়ে এরশাদ ও হেদায়াত এবং ফকীরী-দরবেশী করে আসছিলেন। এ খান্দানের একজন নামকরা বুজুর্গ মাওলানা আবু আহমদ আবদাল চিশতী রহ. (মৃত্যু:৯৬৫ ঈসায়ী) হযরত হাসান মাসনা রহ. বিন হযরত ইমাম হাসান রহ.-এর সন্তান। খাজা কুতুবুদ্দিন মওদূদ চিশতী রহ. সমগ্র ভারতবর্ষে খান্দানে চিশতিয়ার প্রধান পীর বা বড় পীর ছিলেন। সে যুগে ইংরেজী ভাষা ও কৃষ্টি-কালচারের ব্যাপারে মুসলিম সমাজে মারাত্মক ঘৃণা বিরাজিত ছিল। আর আমাদের পরিবারে এ ঘৃণার ভাবটি ছিল আরো প্রকট। কারণ আমাদের পরিবারে ধর্মের সাথে সাথে ছিল ধর্মীয় নেতৃত্বের বিষয়টি। আব্বা ও মা রোকেয়া বেগম দু-জনই ইসলামের একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন। তাদের সুপরিকল্পিত প্রশিক্ষণের ফলে জীবনের শুরুতেই ইসলাম সম্বন্ধে ধ্যান-ধাণার সঠিক রূপটি আমার হৃদয়ে গ্রোথিত হয়ে যায়। আব্বা একেবারে প্রথম দিনটি থেকেই উর্দু ও ফারসীর সাথে সাথে আরবী, ফিকাহ ও হাদীসের শিক্ষা গ্রহণেরও ব্যবস্থা করেন।"

আব্বাজান তার একজন নাম করা ওস্তাদের ব্যাপারে বলেন, "ওস্তাদ মাওলানা আবদুস সালাম নিয়াযী (মৃত্যু ১৯৫৪ ঈসায়ী) ছিলেন তৎকালীন ভারতের শ্রেষ্ঠ আলেমে দীন। কুরআন, হাদীস ও আরবী ভাষায় তার জ্ঞান-গরিমা ছিল অতুলনীয়। কথা-বার্তা, আমল-আখলাকে তিনি ছিলেন একেবারে দরবেশ প্রকৃতির। সাথে সাথে তিনি আব্বার (সাইয়েদ আহমদ হাসান) একজন একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। আব্বা আমার শৈশবেই নিয়াযী সাহেবকে বলে দিয়েছিলেন আপনি ওকে আরবী পড়াবেন। এ জন্য ছোটকালেই আমি তার কাছে আরবী শিক্ষা করতে যেতাম। আব্বা যখন তাকে পারিশ্রমিকের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন কি দিতে হবে ? প্রতি উত্তরে মাওলানা নিয়াযী বলেন, 'আমি ইল্‌ম বিক্রি করি না।' কার্যত তিনি কারো কাছ থেকে কোনো ধরনের বিনিময় গ্রহণ করতেন না।

আল জমিয়ত পত্রিকার সম্পাদনার সময় আবার তাকে অনুরোধ করি, কিছু গ্রন্থ রয়ে গেছে এগুলো আপনার কাছ থেকেই পড়তে চাই। তিনি বললেন, ঠিক আছে। ফজরের পূর্বেই আমার বাসায় চলে এসো। দিল্লীতে তার বাসা আমাদের বাসা থেকে দেড় মাইল দূরত্বে তুর্কমান দরজার কাছে ছিল।

www.pathagar.com

আমি প্রতিদিন ঠিক ফজরের আযানের মুহূর্তে তার দরজায় হাজির হয়ে যেতাম। যেদিন তার শারীরিক অবস্থা ভালো না থাকতো সেদিন বাড়ীর ভেতর থেকেই আওয়াজ আসতো ; ভাই সাইয়েদ বাদশাহ! আজ ভালো লাগছে না কাল এসো।

মাওলানা আবদুস সালাম চিশতীয়া তরিকার অনুসারী ছিলেন। যেহেতু আমাদের পরিবারের নিকট ভারতীয় চিশতীয়া তরিকার নেতৃত্ব ছিল এ জন্য তার (মাওলানা আবদুস সালাম নিয়াযী) থেকে কম বয়স্ক ও তার ছাত্র হবার পরও তিনি আমাকে যথেষ্ট সম্মান করতেন। তাই স্নেহ ও সম্মানের সংমিশ্রণে 'সাইয়েদ বাদশাহ' বলে ডাকতেন।"

১৯২৪ সালের কথা। যখন আব্বা অধ্যয়নে মগ্ন হতেন রাতের তৃতীয় প্রহরে উঠে পড়তেন। তারপর দিল্লীর কুচা পণ্ডিত এলাকা থেকে হেঁটে হেঁটে মাওলানা নিয়াযীর বাসায় যেতেন। মোঘল বাদশাহ শাহজাহানের আমলেই 'কুচা পণ্ডিত' এলাকায় বসতি গড়ে উঠে। কথিত আছে সে যুগে ভারতবর্ষে আরবী ভাষা ও ব্যাকরণ (নাহু ও ছরফ), মা'কুলাত, মায়ানী ও বালাগাত বিষয়ে তার সমকক্ষ কোনো ওস্তাদ ছিলেন না। তিনি একজন স্বাধীনচেতা মানুষ ছিলেন। জিন্দেগীভর কারো চাকুরি গ্রহণ করেননি। আতর বানিয়ে এবং আতরের ব্যবসা করে তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। জ্ঞান দানের বিনিময়ে কোনোদিন অর্থ গ্রহণ করেননি।

আল্লাহ পাকের অশেষ মেহেরবানী যে, তিনি আব্বাজানের ইলম হাসিলের ব্যবস্থা কত মহান ওস্তাদদের মাধ্যমে করেছেন। তিনি দেওবন্দ, মাযহারুল উলুম বা কোনো দারুল উলুম থেকে শিক্ষা লাভের সুযোগ পাননি। এমনকি আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়েও শিক্ষার জন্য যেতে পারেননি আব্বা। অনেক ওলামা আব্বাকে এ জন্যই একজন আলেমে দীন হিসেবে মেনে নিতে পারেননি। কারণ, তিনি কোনো দারুল উলুম থেকে ফারেগ নন এমনকি কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিও তার কপালে জুটেনি। এও বারী তা'আলার মহান কুদরত যে, আজ পৃথিবীর বিভিন্ন বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে আব্বার লেখনী ও চিন্তাধারা, আন্দোলন ও সংগঠনের উপর রিসার্চ হচ্ছে এবং এসব বিষয়ে ছাত্ররা ডক্টরেট করছে আর বড় বড় রিসার্চ পেপার তৈরী হচ্ছে (উচ্চতর গবেষণা পেপার তৈরী হচ্ছে)।

দেশ বিভাগের পর মাওলানা আবদুস সালাম নিয়াযী রহ.-এর এক শাগরিদ হিজরত করে দিল্লী থেকে লাহোরে চলে আসেন। দিল্লী থেকে বিদায়ের মুহূর্তে তিনি ওস্তাদ আবদুস সালাম নিয়াযীর সাথে সাক্ষাত

www.pathagar.com

করতে গেলে ওস্তাদ তাকে বললেন, "লাহোর যাচ্ছ, তাহলে সেখানে আমার দুই শাগরিদ-দু-জন আপন ভাই, ওদের সাথে অবশ্যই সাক্ষাত করবে। এরা হলো সাইয়েদ আবুল খায়ের মওদূদী (২৫ ডিসেম্বর ১৮৯৯-২৮ আগস্ট ১৯৯৭) ও সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী। প্রথম বড়জনের কাছে যাবে, তারপর যাবে ছোটজনের কাছে। অতঃপর 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু'-এর অর্থের উপর মনোনিবেশ করো কেমন।" মাওলানা নিয়াযী র.-এর কথা বলার স্টাইল এমনিতর ছিল। এটাই ছিল মাওলানা আবদুস সালাম নিয়াযী রহ.-এর বৈশিষ্ট্য।

* * *

www.pathagar.com

## আল জিহাদ ফিল ইসলাম রচনা

আসুন, আমরা এবার দেখি সেই লোকের জীবন যাকে তার ওস্তাদ বলতেন "সাইয়েদ বাদশাহ।" সেকালের এক বিখ্যাত ব্যক্তি আব্বা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে মহাকবি আল্লামা ইকবালের নিম্নোক্ত কবিতাটি পড়ে শোনান:

*হার লেহেয হ্যায় মোমিন কি নাই আন নাই শান*
*গুফতার মে, কিরদার মে আল্লাহ কা বোরহান ;*
*ইয়ে রায় কিসিকো নেহি মালুম কে মোমিন ;*
*ক্বারী নজর আতা হ্যায় হাকীকত মে হ্যায় কুরআন।*

*অর্থ : সকল দিকেই মুমিনের নবীন প্রাণের বান ;*
*কথা আর কাজে যে আল্লাহতে পূর্ণপ্রাণ ;*
*এ রহস্য কেহই জানে না ;*
*দৃশ্যতঃ সে ক্বারী, বাস্তবে কুরআন।*

১৯২৬ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে শুদ্ধি আন্দোলনের প্রবর্তক ও নেতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ হঠাৎ এক মুসলমানের হাতে নিহত হন। এ হত্যাকাণ্ডের পর অজ্ঞ ও সংকীর্ণমনা লোকেরা ইসলামের জিহাদনীতি সম্পর্কে ভুল এবং ভিত্তিহীন অপপ্রচার শুরু করে দেয়। এ অপপ্রচারে ও তথ্যসন্ত্রাসের পুরোভাগে ছিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা ও অন্যান্য হিন্দু রাজনৈতিক নেতারা। এ প্রচারণায় গান্ধীজীর মতো সহনশীল ব্যক্তিও প্রভাবিত হয়ে বলতে থাকেন: "ইসলাম এমন পরিবেশে জন্মলাভ করেছে যে, তার চূড়ান্ত শক্তির উৎস আগেও তরবারি ছিল এখনো তরবারিই আছে। অতীতে তরবারির সাহায্যেই ইসলাম প্রচারিত হয়েছে এবং বর্তমান কালেও তাই হচ্ছে।"

এ বিষয়ে আব্বাজান একস্থানে লিখেছেন, "সে যুগে এ অপপ্রচারের ডামাডোল অত্যন্ত জোরেশোরে চলছিল। এমনি সময়ে একদিন দিল্লীর জামে মসজিদে জুমু'আর খুতবা দিচ্ছিলেন মাওলানা মুহাম্মদ আলী জওহর (মৃত্যু: ৪ জানুযায়ী ১৯৩১)। এ সমস্ত ভিত্তিহীন ও উস্কানিমূলক অপপ্রচারের মুখ বন্ধ করা প্রসঙ্গে অত্যন্ত দুঃখ, হতাশা ও আবেগ আপ্লুত হয়ে খুতবায় বলেন, "আহ! হায় আল্লাহ! আজ যদি ভারতবর্ষে এমন কোনো আল্লাহর বান্দা থাকতো, যে তাদের এসব হীন প্রচারণার দাঁতভাঙ্গা জবাব দিত আর ইসলামের জিহাদ নীতির উপর একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করে ইসলামের প্রকৃত রূপ তুলে ধরতো, তাহলে কতই না ভাল হতো।" এ খুতবার শ্রোতৃমণ্ডলীতে আমিও

www.pathagar.com

ছিলাম। নামায শেষে জামে মসজিদের সিঁড়ি বেয়ে নামার সময় চিন্তা করতে লাগলাম আর মনস্থির করতে চাইলাম, আচ্ছা আমি নিজেই আল্লাহর নামে তার উপর ভরসা করে একটু চেষ্টা করে দেখি না কেন।"

আব্বা তখন দিল্লী থেকে প্রকাশিত আল জমিয়ত পত্রিকার সম্পাদক। এরপর ১৯২৭ সালের সূচনাতেই তিনি 'আল জিহাদ ফিল ইসলাম' শীর্ষক সিরিজ প্রবন্ধ আল্ জমিয়তের পাতায় প্রকাশ করতে থাকেন। পরবর্তী সময়ে পত্রিকার প্রবন্ধ মোটামুটি একত্রিত করে এক বিরাট গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এ সময় আব্বার বয়স ছিল মাত্র ২৪ বছর। আলোড়ন সৃষ্টিকারী এ গ্রন্থে তিনি ইসলামী জিহাদের কারণ, উদ্দেশ্য, পরিধি ও ব্যাপ্তি সকলের সামনে দলিল প্রমাণসহ উপস্থাপন করেন। ইসলামী জিহাদ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার পথে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য একটি সুসংগঠিত ও চলমান ধারাবাহিক প্রচেষ্টা। এটা কখনই কোনো হিংসাত্মক ও অন্যায় রক্তপাত ঘটায় না। ইসলামী জিহাদ মজলুম মানবতার রক্ষাকবচ, কোনো গোপন সন্ত্রাসী তৎপরতা নয়। এটা উন্নতি ও অগ্রগতির নিয়ামক শক্তি, পর্দার আড়ালের কোনো কাজ নয়। এ জিহাদ যুদ্ধ ও শান্তির ইসলামী নীতি। মুসলিম মুজাহিদরা তো দুশমনদের রক্ষাকারী ও আশ্রয়দাতা হিসেবেই অন্য ভূখণ্ড পদানত করে থাকে। সে তো যুদ্ধ বন্দীদের সাথে অতি উত্তম আচরণ করতে বলে। যুদ্ধবন্দীদের মানবাধিকার প্রদানের ব্যাপারে ইসলাম আপোষহীন। ইসলামের মুজাহিদরা তো নারী-শিশু-বৃদ্ধ এবং রোগীদের কিছু বলবে না এবং সাথে সাথে উপাসনালয়সমূহের পূর্ণ নিরাপত্তা বিধান করবে।

'আল্ জিহাদ' পুস্তকে ইসলামী জিহাদের বিরুদ্ধে ইহুদী-খৃস্টান-হিন্দু চক্রের অসত্য ও অন্যায় অপরাধমূলক প্রোপাগাণ্ডার দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়া হয়েছে। জিহাদ অতীতে যেমন ছিল মূল আলোচ্য বিষয়, ঠিক তেমনি আজও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। তবে আফসোস, জিহাদের আসল হাকীকত মুসলিম ও অমুসলিম নির্বিশেষে সবাই বেমালুম ভুলে বসে আছে।

* * *

www.pathagar.com

# মহাকবি ইকবাল হিজরত আল জিহাদ

'আল জিহাদ ফিল ইসলাম' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার পর গ্রন্থটি আগাগোড়া পড়ে মহাকবি আল্লামা ইকবাল বলেন, "জিহাদ, যুদ্ধ ও সন্ধি সম্পর্কে ইসলামী আইন-কানুন সম্বলিত এ গ্রন্থখানা অভিনব ও চমৎকার। প্রত্যেক জ্ঞানী ও সুধী ব্যক্তিকে গ্রন্থটি পাঠ করে দেখার জন্য অনুরোধ করছি।" বইটি কবি-দার্শনিক ও ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা ড. ইকবালের সাথে আব্বার পরিচয়ের সূত্রপাত ঘটায়। মহাকবি ইকবালের সাথে সাক্ষাত করতে আব্বা লাহোর গমন করেন। ১৯৩৭ সালেই কবি তাকে পাঞ্জাবে এসে সকল কাজকর্ম করতে দাওয়াত দেন। যাতে করে পরিপূর্ণ একাগ্রতার সাথে জিহাদ-ইজতেহাদ, শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ও সাংগঠনিক কর্মতৎপরতা চালানো যায়। মহাকবি ইকবালের আহ্বানে আব্বা ১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাসে আম্মাকেসহ পরিবার পরিজন নিয়ে দাক্ষিণাত্যের হায়দ্রাবাদ থেকে হিজরত করে চলে আসেন পূর্ব পাঞ্জাবের অজপাড়াগাঁ পাঠানকোটের জামালপুরে। কালস্রোতে এ অজপাড়াগাঁ হয়ে উঠে উপমহাদেশের ইসলামী আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র দারুল ইসলাম পাঠানকোট। তবে পরিতাপের বিষয় যার দাওয়াতে আব্বা পাঞ্জাবে আসলেন, সেই কবি ইকবাল আব্বার আসার কয়েকদিনের মাথায় অর্থাৎ ২১ এপ্রিল ১৯৩৮ তারিখে চলে যান পরপারে। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) এ ঘটনা আব্বাকে দারুণভাবে বেদনাহত করে।

এখানে উল্লেখ্য, উসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এ সময় আব্বা লেকচারার পদে একটি লোভনীয় চাকুরির অফার পান। কিন্তু আদর্শিক কারণে অর্থাৎ তারজুমানুল কুরআন প্রকাশের স্বার্থে আব্বা মোটা বেতনের লোভনীয় চাকুরির অফারও ফিরিয়ে দেন।

এ যেন বিধির বিধান মানুষের জীবন প্রবাহ ; কিন্তু কেন যেন মনে হয় অলৌকিক। বিশেষভাবে আল্লামা ইকবালের ইন্তেকালে ভারতবর্ষে মুসলিম মানসে যে ঘাটতি সূচিত হয় তা যেন আব্বাকে দিয়ে পূরণ করানো একটি কুদরতি ফায়সালা ছিল।

লাহোরের মাটি এ ক্ষেত্রে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দাবীদার। এ ভূমি কখনো অলি-আউলিয়া, পুণ্যবান ও সাধক মুক্ত থাকেনি। সাইয়েদ আলী হুজায়রী রহ. (১০০৯-১০৭২খৃ.) এক খ্যাতিমান বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর রূহানী শক্তির গভীর প্রভাব পাঞ্জাব অঞ্চলের মাটি ও মানুষের উপর ক্রিয়াশীল। খাজা নিজামউদ্দিন আউলিয়া রহ. (মৃত্যু : ১৩৩৫ ঈসায়ী) বর্ণনা করেন

www.pathagar.com

সাইয়েদ আলী হুজায়রী নিজ মুর্শিদের নির্দেশ মোতাবেক আল্লাহর দীনের প্রচার প্রসারের লক্ষ্যে সুলতান মাহমুদ গজনবীর (মৃত্যু : ১৮ এপ্রিল ১০৩০ ঈসায়ী) পুত্র সুলতান নাসির উদ্দীন মাসুদের (১০৪০ ঈসায়ী) যুগে লাহোর আগমন করেছিলেন। তার আগে তাঁর পীরভাই হোসাইন রানজায়ী এখানে দীনের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। যখন তাঁর উপর লাহোর যাওয়ার নির্দেশ হলো তখন তিনি স্বীয় মুর্শিদের নিকট এই বলে আরজ করেন যে, আমার সেখানে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ সেখানে হোসাইন রানজায়ী দীনের দায়িত্ব পালন করেছেন। একথা শুনে তার মুর্শিদ বললেন, যাই হোক তোমাকে যেতেই হবে। সাইয়েদ আলী হুজায়রী বর্ণনা করেন, আমি অনেক রাতে লাহোর পৌঁছে দেখলাম নগরীর প্রধান ফটক বন্ধ হয়ে গেছে। বাধ্য হয়ে আমাকে নগরীর বাইরে রাত কাটাতে হলো। সকালে যখন নগরীর প্রধান ফটক খোলা হলো প্রথমেই দেখতে পেলাম হোসাইন রানজায়ীর কফিন শহরের বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সাইয়েদ আলী হুজায়রী লাহোরেই দীন প্রচার প্রসারের কাজ করেন এবং এ লাহোরেই ইন্তেকাল করেন। এ শহরেই তাকে দাফন করা হয়েছে।

সুতরাং আমরা কয়েক শতাব্দী পর দেখতে পাই আল্লাহর অপর এক অলি, দীনের খেদমতগার হিজরত করে লাহোরে আগমন করেন যার সাধনার আলোতে শুধু লাহোরে নয়, পাক-ভারত উপমহাদেশসহ শতাব্দীর গোটা পৃথিবী আলোকিত হয়েছিল। তার সাধনা ও চেষ্টায় ইসলামের সঠিক চিত্র পাওয়া যায়। যাতে মানুষ দীনের সঠিক জ্ঞান লাভে সক্ষম হয়। এখানে পাশ্চাত্যের সভ্যতা সংস্কৃতি এমনভাবে শিকড় গেড়ে বসেছিল যে, মানুষ তার জীবনের সকল ক্ষেত্রে এর অন্ধ অনুকরণে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। তিনি পাশ্চাত্যের মানসিক গোলামীর জিঞ্জির ভাঙ্গার দায়িত্ব খুবই সুনিপুণভাবে পালন করেন। শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি সকল ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তনের মাধ্যমে তিনি একটি বিপ্লবী আন্দোলনের ভিত্তি রচনা করেন। আর তিনিই হলেন বিংশ শতাব্দীর মুক্তিদূত সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ.। তার নিজের লেখনিতেই এর একটি চিত্র পরিস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। তিনি বলেন, পাশ্চাত্যের কাছে মুসলমানদের সামরিক ও রাজ নৈতিক পরাজয়ের চেয়ে ভয়াবহ পরাজয় হলো সভ্যতা-সংস্কৃতি ও দর্শনের ক্ষেত্রে পরাজয়। কারণ রাজনৈতিক পরাজয়ের মাধ্যমে শুধু মানুষের শারীরিক পরাজয় ঘটে। কিন্তু সাংস্কৃতিক পরাজয়ের মাধ্যমে মানুষের মন-মগজ, চিন্তা-চেতনা, বোধশক্তির পরাজয় হয়। ইংরেজী জ্ঞান, ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, সংস্কৃতি, সভ্যতা আমাদের মুসলমানদের এমন ব্যক্তিবর্গের জন্ম

www.pathagar.com

দিয়েছে যাদের মস্তিষ্ক সম্পূর্ণরূপে এর কাছে পরাভূত। পশ্চিমা জীবন দর্শনের যে ছক ও চিত্র তাদের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে তা থেকে সরে গিয়ে নিজেদের জীবন পরিচালনার বিষয় এরা ভাবতেই অক্ষম।

আল জিহাদ রচনার পূর্বে আব্বা ভালোভাবে গীতা, রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ করেন। সাথে সাথে বাইবেল ও তালমুদ পাঠ করেন গভীরভাবে। এরপর মাওলানা আশফাকুর রহমান কান্ধলভী রহ.এর কাছ থেকে ইল্‌মে হাদীসের দুটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ জামে' তিরমিযী ও মুয়াত্তা-এ ইমাম মালেক রহ.-এর পাঠ গ্রহণের সিলসিলা চলতে থাকে। আব্বা বিভিন্ন বিষয়ে লিখেছেন ও গবেষণা করেছেন। তার লেখনীতে ব্যাপক বিষয়ের সমাবেশ ঘটেছে। জ ড়বাদী পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতির মন ভোলানো জৌলুসের ঔজ্জ্বল্যে মুসলিম যুবসমাজ যখন আল্লাহদ্রোহিতা ও ফেতনায় নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিল তখন আব্বা তাঁর লেখনী দ্বারা আলোর মশাল প্রজ্জ্বলিত করেন। মুসলমানদের পতন যুগে পাশ্চাত্যের আল্লাহহীন মতবাদ ও চিন্তাধারা, পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও আচার-আচরণ যেভাবে মুসলিম যুব মানসে প্রভাব বিস্তার করে তাদের পাশ্চাত্যের মানসিক গোলামে পরিণত করছিল আব্বা তাঁর অসাধারণ লেখনী শক্তি দ্বারা মুসলিম যুব সমাজের চিন্তার রাজ্যে এক অনন্য বিপ্লব সাধন করেন। বর্তমান যুব সমাজকে দীন ইসলামের উপর গর্ব করতে শিখিয়ে গেছেন তিনি লেখনীর দ্বারা। তাফহীমুল কুরআনের মতো অনবদ্য তাফসীর রচনা করে তিনি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজের সম্পর্ক কুরআনের মূলবাণীর সাথে জুড়ে দেন এবং তাদের চিন্তার রাজ্যে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়।

কোনো যুগই ফেতনা মুক্ত নয়। প্রত্যেক যুগেই ফেতনা থাকে। আমাদের বর্তমান যুগের ফেতনা হচ্ছে শিক্ষিত ও বুদ্ধিবৃত্তিক জাহেলিয়াত। অর্থাৎ বর্তমান যুগে আধুনিক শিক্ষিত কোনো ব্যক্তি মানুষ একটি উচ্চতর ডিগ্রী বা কোনো ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করতে পারলেই নিজেকে সক্রেটিস, প্লেটো বা কোপারনিকাস ভাবতে থাকে। কিন্তু এ শিক্ষিত লোকেরাও আব্বার বই পড়ে বুঝতে পারতো যে এ নিছক ছেলেমানুষী নয়।

কিন্তু আব্বাজানের প্রকৃতি ছিল ভিন্নতর। দিনের শেষে যখন সবাই গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়তো তখন তিনি জেগে থেকে জ্ঞান চর্চা করতেন। উম্মতে মুহাম্মদী সা. তমাসাচ্ছন্ন দিনগুলোতে এভাবেই তিনি আলোর মশাল জ্বালিয়ে মশালচির মতো দিকভ্রান্ত জাতিকে সত্য ও ন্যায়ের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের দিকে আহ্বান করে গেছেন অবিরত।

www.pathagar.com

## আম্মার দেখা স্বপ্ন

আম্মার বয়স তখন বারো বছর। আম্মা (মরহুমা মাহমুদা বেগম) একটি স্বপ্ন দেখেন। স্বপ্নের বর্ণনায় তিনি বলেন, "আমি মাটিতে পা দিয়ে একটু করে মাটি খুড়ে ছোট্ট একটি গর্ত করি। গর্ত থেকে পা উঠিয়ে যখন হাত দিলাম দেখি আমার হাতে জ্বলজ্বল করা হীরার টুকরা। এতো সুন্দর হীরা যে, দৃষ্টি ফিরানো যাচ্ছিল না। এরই মধ্যে চারপাশ থেকে লোকজন জড়ো হতে থাকলো হীরা দেখার জন্য। তারা বলতে লাগলো, এ হীরা অত্যন্ত দামী, তুমি এটা পেলে কোথায় ? একজন বললো, এ দামী হীরা যত্ন করে রেখো। কেউ যেন এটা ছিনিয়ে নিতে না পারে।" সকালে আম্মা স্বপ্নের কথা প্রথমেই নানাজানকে (সাইয়েদ নাসির উদ্দিন শামসী) জানান। নানাজান এ স্বপ্নের কথা কাউকে বলতে নিষেধ করেন এবং স্বপ্নের তাবীর জানার জন্য দিল্লীর একজন আলেমের নিকট চলে যান। সেই আলেমে দীন বলেন, আপনার কন্যার বিয়ে এমন এক আলেমে দীনের সাথে হবে যার খ্যাতি বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত হবে।

সে সময় নানাজান আর্থিকভাবে অত্যন্ত সচ্ছল ছিলেন এবং সামাজিকভাবে দিল্লীর সুপরিচিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য হতেন। দিল্লীর বিভিন্ন ধনী ও সম্ভ্রান্ত পরিবার থেকে আম্মার জন্য একের পর এক বিবাহের প্রস্তাব আসতে থাকে কিন্তু কোনো ছেলেই নানাজানের মনপুত হচ্ছিল না ; কিন্তু যখন দাদীমা আব্বার জন্য বিয়ের প্রস্তাব দেন তখন নানার কাছে জামাতা পছন্দ হয়ে যায়।

আব্বা জীবনের শুরুতেই সংগ্রাম করে বেড়ে উঠেন। শৈশব থেকেই প্রচুর সফর, বার বার ঘর-বাড়ী রদবদল ও আর্থিক দৈন্যদশায় গড়ে উঠেন তিনি। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাদাসিধা আবার স্পষ্টভাষী। তাই বিয়ের আগেই তিনি শ্বশুরকে রাখঢাক ছাড়াই বলে দেন আমার জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে পরিষ্কার, এর সাথে আমি কোনো আপোষ করবো না। আল্লাহ পাক তৌফিক দিলে সুন্দর একটি বাড়ী বানিয়ে নিব, কারণ অর্থ-সম্পদ থাকতে আমি অসচ্ছলভাবে জীবন যাপনে বিশ্বাসী নই। কিন্তু আল্লাহ পাক যদি আর্থিক সচ্ছলতা না দেন তাহলে আর্থিক অভাব অনটনের মধ্যেও নিজের মিশনকে ছাড়বো না।

আব্বার একথার জবাব আমার নানার বাবা তথা আম্মার দাদা চিঠির মাধ্যমে আব্বাকে অবহিত করেন। এ চিঠি পাঠানোর পূর্বে নানাজান, নানী

www.pathagar.com

ও আম্মার সামনে পড়ে শোনান। আম্মা বলেন, এ চিঠিতে লেখা ছিল, "আমাদের মেয়ে রাজপ্রাসাদেও তোমার সঙ্গ দিবে, আর ঝুপড়ি ঘরেও তোমার সঙ্গে থাকবে।" একথা প্রসঙ্গে আম্মা প্রায়ই বলতেন, "দাদাজানের কথাগুলো জিন্দেগীভর আমার হৃদয়ের তন্ত্রীতে বেজেছে এবং আমার কাজ কর্ম ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সর্বদা আমাকে সাহস যুগিয়ে গেছে।"

১৯৩৭ সালের ১৫ মার্চ আম্মাজান দিল্লীতে আব্বার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। মোহরানা নির্ধারিত হয় দু-হাজার টাকা। কারণ আব্বা পরিষ্কার বলে দেন, মোহরানা আদায় করার জন্যই নির্ধারিত করা হয়, তাই এ পরিমাণের বেশী আমি আদায় করতে পারবো না।

বরপক্ষ থেকে পাঠানো সামগ্রীতে ছিল একটি শাড়ী ও একটি আংটি। সেকালে দিল্লীর অভিজাত পরিবারে নিদেন পক্ষে সোয়া লক্ষ টাকা মোহরানা নির্ধারিত হতো, তবে বরপক্ষ মোহরানা আদায়ের ভাবনামুক্ত থাকতো।

* * *

www.pathagar.com

# দারুল ইসলাম পাঠানকোটে

*যা আব ও গুল খোদা খুশ পেকরে সাখত*
*জাহানে আয ইরম যেয়বা তারে সাখত*
*দিলে সাকী বাঁ আতিশ কে দারদ*
*যে খাকে মান জাহাঁ দিগারে সাখত।*

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা মাটি আর পানির সমন্বয়ে এক দারুণ বস্তু মানুষ সৃষ্টি করেছেন, আর যেন এ পৃথিবীকে জান্নাতের মতো করেই সৃজন করেছেন। কিন্তু সাকী আগুন দিয়ে বানিয়ে ফেললো ভিন্ন এক বিশ্বজগত।

জম্মুর পর্বতশ্রেণী যেখানে এসে শেষ হয়েছে ঠিক সেখানেই ছোট্ট শহর পাঠানকোট। পাঠানকোটের নিকট জামালপুর নামক এক নিভৃত পল্লীতে চৌধুরী নিয়ায আলী খান রহ.-এর (মৃত্যু ২৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৬) জওহরাবাদ বিশাল ভূসম্পত্তি ছিল। এখান থেকে নিকটবর্তী রেলস্টেশন সার্নার দূরত্বও প্রায় তিন মাইল। এ নিভৃত পল্লীতে মহাকবি আল্লামা ইকবালের পরামর্শে নিয়ায আলী সাহেব একটি ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করেন। আব্বাজান এ ট্রাস্টের নাম দেন দারুল ইসলাম ট্রাস্ট। এ ট্রাস্টের অধিভুক্ত এলাকা পরবর্তী ইতিহাসে দারুল ইসলাম পাঠানকোট নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

দারুল ইসলাম পাঠানকোটেই আমি ছোটবেলায় বেড়ে উঠি। আর শৈশবের কয়েকটি বছরও আমার সেখানে কাটে। দারুল ইসলাম ছিল শহরের কোলাহল মুক্ত অপরূপ নিভৃত এক পল্লী। আমাদের বাড়ীর কাছে যে পর্বতশ্রেণী ছিল তা প্রায়ই বরফে ঢাকা থাকতো। সূর্য উদয়ের পর নানা রঙে রঞ্জিত হয়ে উঠতো পাহাড়ী বরফ। সূর্য যখন ঢলে পড়তো তখন বরফ ধীরে ধীরে সাদা রঙ ধারণ করতো। শহরের নাগরিক সুবিধার কোনো কিছুই ছিল না দারুল ইসলাম পাঠানকোটে। এখানে কোনো বিদ্যুতের ব্যবস্থা ছিল না। রাতে কেরোসিন তেলের বাতি জ্বালিয়ে কাজ কর্ম করতে হতো। আধুনিক বাড়ী-ঘর ও আধুনিক বাথরুম টয়লেটের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। কূপ থেকে পানি তুলে গোসলাদি ও রান্নার কাজ সারতে হতো। ঘরদোর ছিল সাদাসিধা, এতো কম সুবিধাদির দিকে খেয়াল রেখে আব্বা সর্বদা আম্মার মন জয় করার চেষ্টা করতেন। আমার আম্মা ছিলেন দিল্লীর অতি অভিজাত উচ্চ শিক্ষিত সাইয়েদ বংশের কন্যা। তিনি নিরতিশয় ধৈর্য ও প্রশান্ত হৃদয়ে দারুল ইসলামের এ নিভৃত পল্লীর আবাসকে মেনে নিয়েছিলেন। সঙ্গ দিয়েছিলেন তার প্রিয়তম জীবন-সঙ্গীর।

www.pathagar.com

গ্রাম থেকে শহরে যাতায়াতের জন্য আব্বা একটি টমটম ক্রয় করে নেন। এ টমটম গাড়ীর পরিচালক বা কোচোয়ান ছিল তুখতা বেগ নামক এক তুর্কীস্তানী ব্যক্তি। আব্বা দিল্লী থেকে একজন দক্ষ পাচক এনে নিয়োগ দেন, পাচকের নাম ছিল মকবুল। আর বাচ্চাদের দেখাশোনার জন্য ছিল একজন আয়া। এ তিনজন কর্মচারী অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও ত্যাগী ছিল। আম্মা প্রতিদিন সকালে আয়াকে ডেকে বলে দিতেন প্রতিদিনকার খাবার তালিকা। আয়া সে অনুযায়ী বাজারের লিস্ট করে পাচক মকবুলের কাছে দিয়ে দিত। মকবুল রান্না শেষ করে দুপুরে ও রাতে দুবার তৈরী খাবারের হাড়ি ড্রয়িং রুমের পাশের কামরাতে রেখে যেত। এরপর আয়া আম্মাকে ডেকে খানা বুঝিয়ে দিত। আমাদের বাবুর্চিখানা সে সময় ছিল বাড়ীর বাইরে। ফলে পাচক মকবুলকে কখনো অন্দরমহলে আসতে হয়নি। তুখতা বেগও ভিতরে আসতো না। এভাবেই আমরা কোনোদিন পুরুষ কর্মচারীকে আমাদের অন্দরমহলে আসতে দেখিনি।

'রোড-টু মক্কা'র লেখক ও বিশ্বখ্যাত পরিব্রাজক মোহাম্মদ আসাদ (মৃত্যু ফেব্রুয়ারী ১৯৯২) তার স্ত্রী মুনিরা ও শিশুপুত্র তালালকে সঙ্গে নিয়ে দারুল ইসলামে আসেন। তিনি এখানে কয়েকদিন অবস্থান করেন। আব্বা মোহাম্মদ আসাদ সাহেবকে একদিন নৈশভোজে আমন্ত্রণ করেন। আম্মা বিয়ের সময় উপহার হিসেবে পিত্রালয় থেকে যে দামী ডিনার সেট পেয়েছিলেন সেটা বের করে খাবার সাজালেন। মকবুল সেদিন দারুন রান্না করেছিল। খাওয়া দাওয়ার পর্ব শেষে যাবার সময় আল্লামা মুহাম্মদ আসাদ এবং তার পত্নী রান্নার ভূয়সী প্রশংসা করেন। দাওয়াত করে নৈশভোজে আপ্যায়িত করায় আব্বা-আম্মাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য ঐ সময়ের ট্রেডিশন অনুযায়ী পানির গ্লাস জালির রুমাল দিয়ে ঢেকে রাখা হতো। ধুলো বালি থেকে রক্ষার জন্য এটা করা হলেও সেই জালির রুমালগুলো ছিল দারুণ কারুকার্যময়। জালির রুমালের চারপাশে ঝুলন্ত মোতিগুলো একদিকে রুমালকে স্বস্থানে থাকতে সাহায্য করতো অন্যদিকে দস্তরখানায় দেয়া খাবারের শোভা বর্ধন করতো।

সে সময়ের আরও একটি ঘটনা। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতা পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর প্রাইভেট সেক্রেটারী অসুস্থ হয়ে নিজ গ্রামে আসেন। তার গ্রাম ছিল সার্নার নিকটেই। তিনি আশেপাশের লোকজনের কাছে আব্বার কথা শুনে দারুল ইসলামের কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারেন। একদিন সেই সেক্রেটারী কিছু হিন্দু বন্ধু-বান্ধবসহ দারুল ইসলামে আব্বার সাথে সাক্ষাত করতে আসেন। সাক্ষাতের সময় তিনি

www.pathagar.com

অত্যন্ত তির্যক প্রশ্নবাণ ছুড়তে থাকেন। তার প্রশ্ন ছিল ইসলাম ও মুসলমানদের উপর বুদ্ধিবৃত্তিক সাঁড়াশী আক্রমণের মতো। আব্বা তার আক্রমণাত্মক প্রশ্ন অত্যন্ত ধীরস্থিরভাবে প্রশান্ত হৃদয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ জবাব দেন। আব্বার বক্তব্য শুনে তিনি লা-জবাব হয়ে যান। আব্বার ধৈর্য- স্থৈর্য ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ জবাবে তিনি যথেষ্ট প্রভাবিত হন এবং তির্যক ও আক্রমণাত্মক প্রশ্নের কোমল ও চিন্তাশীল জবাবে তিনি সত্যিই বিমোহিত হয়ে পড়েন। পরবর্তীতে তিনি তার বন্ধু-বান্ধবদের বলেছিলেন, আগে জানতাম না যে মুসলমানদের মধ্যেও এতো সুন্দর সংগঠন, জ্ঞান ও প্রতিভা লুকিয়ে আছে। দূর দূরান্তের প্রত্যন্ত এ গ্রামাঞ্চলে যখন এত বড় বড় প্রতিভাবান স্কলার আছে তাহলে বড় বড় শহরগুলোর অবস্থা না জানি কি হবে ?

এ ঘটনার কয়েকদিন পরের কথা। দরুল ইসলামে অনুষ্ঠিত একটি প্রোগ্রামে যোগদান করতে আসেন মাওলানা মুহাম্মদ মনযুর নোমানী ও মাওলানা জাফর আহমদ (মালওয়ারী)। তাদের সাথে আরো আলেম-ওলামা ছিলেন। তারা দারুল ইসলামে এক দেড় সপ্তাহ অবস্থান করেন। আব্বাজান তাদের সকলকেই দাওয়াত করে আমাদের বাসায় একবেলা খাওয়ার আয়োজন করেন। সাথে সাথে আম্মাকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়ে বলেন, আমরা তোমার যে প্লেটগুলোতে সচরাচর খানাপিনা করি সেগুলোতেই খাদ্য পরিবেশন করবে। তোমার বিয়ের ডিনার সেট বের করবে না আর পানির গ্লাসগুলোও মোতিদার রুমাল দিয়ে ঢাকবে না।

আম্মা আক্ষেপ করে বললেন, এত বড় বড় ওলামায়ে দ্বীন আমার ঘরে আসবেন, আর তাদের সম্মানে আমার ভালো প্লেটগুলোও বের করবো না আর তামার প্লেটে তাদের খাওয়াব এ কেমন করে হয় ? আব্বাজান তার স্বভাবসুলভভাবেই বললেন, খুববেশী মজাদার নামী দামী খানার আয়োজন করো না, আমরা প্রতিদিন যা খাই তাই পরিবেশন করো। একথা শুনে আম্মা একটু রেগে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন এভাবে, আচ্ছা, আমরাই যদি আমাদের দীনদার লোকদের সম্মান না দেই তাহলে সাধারণ লোকদের কাছে এটা কিভাবে আশা করবো ?

যাই হোক, মকবুল দারুন খাবার রেধেছিল সেদিন। আর আম্মা পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে সর্বোত্তম বাসনকোসন দিয়ে সাজিয়ে দিলেন দস্তরখানা। মেহমানরা আসলেন, মেহমানদারী করা হলো ভরপুর। এ ঘটনার ক'দিন পরেই কানাকানি ফিসফিসানি শুরু হলো। যার পরিণতিতে তারা জামায়াত থেকে ইস্তফা দিয়ে দিলেন। সেই সম্মানিত হযরতরা তাদের পরিচিত বন্ধু মহলে বলতে থাকলেন, মাওলানা মওদূদী আসলে

www.pathagar.com

দীনদারীর ছদ্মাবরণে দুনিয়াদার মাওলানা মানুষ। মাওলানা মওদূদীর ঘরে খানসামা রান্নাবান্নার কাজ করে। বাচ্চাদের লালন পালনের জন্য আয়া আছে। তাহলে তার বিবির কাজটা কি ? আমরা শুনেছি তার বিবি সাহেব কখনো শাড়ী পরেন আর কখনো গাড়ারা পরে সেজেগুঁজে বসে থাকেন। পান খাওয়ার জন্য তার পানদানী রূপার তৈরী। আর যে ডিব্বায় পান সাজিয়ে রাখা হয় তাও রূপার তৈরী (অথচ এসবই তামার তৈরী ছিল, রূপার নয়। শুধু প্লেটিং করা ছিল রূপার)। আয়া মাওলানার বাচ্চাদের ছোট গাড়ীতে বসিয়ে বেড়াতে নিয়ে যায়। এসব কি দীনদারীর লেবাসে ধোঁকাবাজী নয় ?

দাদী মা মুহতারিমা রোকেয়া বেগম (১৮৭৩-৭ ডিসেম্বর ১৯৫৭) এসব কথা শুনে বললেন, শরীরের মাপ বুঝে জামা বানাতে হয়।

এ অঘটনের পর আম্মা আর কোনোদিন আব্বার সাথে দ্বিমত করে নিজের ইচ্ছাকে কার্যকর করেননি। সারা জীবন তিনি দুঃখ করে গেছেন যে, হায়! আমি যদি তার (নিজ স্বামীর) কথা মতো সাদাসিধে খানা তৈরী করে সাধারণ তামার বাসনে পরিবেশন করতাম তাহলে জামায়াতের এতো বড় ক্ষতি হতো না।

এ দুর্ঘটনা বা অঘটন, যাই বলি না কেন, হয়তো এজন্যই সারাজীবন আমরা কোনোদিন পিতা-মাতার মধ্যে কথা কাটাকাটি বা উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হতে দেখিনি। অবশ্য একটি ব্যতিক্রম আছে, যখন আম্মা ও দাদীর সাথে যৌথভাবে আব্বার তীব্র মতবিরোধ হয় তখন দু-জনের কেউই আব্বার সিদ্ধান্ত সহজে মেনে নেননি।

* * *

www.pathagar.com

# দেশ বিভাগ : আগস্ট ১৯৪৭

এ ব্যতিক্রম ধর্মী ঘটনা ঘটেছিল ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে, যখন দেশ বিভাগের কারণে সমগ্র ভারতবর্ষ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। নির্যাতিত মানবতা শান্তি আর নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ঘুরতে থাকে। আব্বাজান ও দারুল ইসলামে অবস্থানরত কর্মীবাহিনীর দৃঢ়তার কারণে পাঠানকোটে কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি। এমনিতেই দারুল ইসলাম পাঠানকোট থানা ছিল পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার অধীন। আর ১৪ আগস্ট রেডিও মারফত জানা গেল গুরুদাসপুর ভারতের অন্তর্ভুক্ত হবে। অথচ গুরুদাসপুরের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী ছিলেন মুসলমান। আর এ মুসলমানদের পাকিস্তানে হিজরত ছাড়া উপায় নেই।

দারুল ইসলামের নিরাপত্তার জন্য আব্বা অতি বিচক্ষণ সেনাধ্যক্ষের মতো কাজ করেন। তার নির্দেশে দারুল ইসলামে কয়েকটি পরিখা খনন করা হলো এবং দুটি মাত্র বন্দুক ও লাঠিসোটাসহ সকলে প্রস্তুত থাকলো যেকোনো হিন্দু-শিখ হামলা মোকাবিলার জন্য। অপর দিকে জামায়াতের দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণ দাঙ্গা থেকে বিরত থাকার জন্য শিখ নেতবৃন্দকে বার বার অনুরোধ করতে থাকেন। ফলে কয়েক দিনের জন্য দারুল ইসলাম এক নিরাপদ জনপদে পরিণত হয়। এ খবর পেয়ে আশেপাশের গাঁ-গ্রাম থেকে মুসলমানরা নিজেদের ঘর-বাড়ী সর্বস্ব ত্যাগ করে জীবন ও গৃহপালিত জন্তু-জানোয়ার নিয়ে দারুল ইসলামে জমা হতে থাকে। মানুষের চাপে এ ক্ষুদ্র পল্লী পরিণত হয় যেন জনসমুদ্রে।

এতোগুলো মানুষকে নেয়ার জন্য সেনা কনভয়ের সাথে আসলো মাত্র তিনটি বাস। এ তিনটি বাসের মধ্যে একটি বাস চৌধুরী নিয়ায আলী খান সাহেবের পরিবারবর্গের জন্য পাঠিয়ে দেয়া হলো। রয়ে গেল দুটো বাস। এ বাস দুটোতে চেপে দারুল ইসলামে অবস্থানরত সকল নারী-পুরুষ. বৃদ্ধ-শিশুকে যেতে হবে নব্য স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানে।

আব্বাজান তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত দিলেন, এখন শুধুমাত্র নারী ও শিশুরা বাস দুটোতে চলে যাক, পুরুষরা পরে আসবে। এ ছিল এক কঠিন সিদ্ধান্ত।

অন্যদিকে বাস ও কনভয়ের সাথে আগত সেনা সদস্যরা বলছিল, দশ মিনিটের মধ্যে সকলে বাসে উঠে পড়ুন, সময় নেই, সময় নেই। তারা সমানে বাঁশী বাজিয়ে যাচ্ছিল। এ অবস্থায় আম্মা ও দাদী মিলিতভাবে

www.pathagar.com

বললেন, আমরা পুরুষদের ছাড়া যাবো কিভাবে ? যেখানে প্রতিটি পদক্ষেপ বিপদ সংকুল। পথে পথে দাঙ্গাবাজ শিখেরা কৃপাণ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একই অবস্থা প্রতিটি ঘরে। আর সেখানে আমাদের ঘর ছিল আদর্শ স্থানীয়, এজন্য সকলে আম্মা ও দাদীর দিকে তাকিয়ে ছিল। কোনো নারীই সেদিন তার পুরুষ সাথীকে, মা পুত্রকে, কন্যা পিতাকে কোনো বোনো ভাইকে এ শ্বাপদসংকুল জনপদে রেখে নিরাপদ আশ্রয়ে সন্ধানে পাকিস্তানে যেতে চাচ্ছিল না। সবার ইচ্ছা ছিল একত্রে যাওয়া। আর যানবাহনের অপ্রতুলতায় এটাও ছিল অসম্ভব।

এ অবস্থায় আব্বা বললেন, "আশেপাশের ও দূর-দূরান্তের বিপন্ন মুসলমানরা দারুল ইসলামে আমার কাছে এসেছে আশ্রয়ের জন্য। আমি কিভাবে ওদেরকে হিন্দু-শিখদের কৃপাণের সামনে ফেলে দিয়ে নিজ স্ত্রী-পরিজন ও সন্তানদের নিয়ে চলে যাই ?" আব্বাজান আরও বললেন, "স্ত্রী-সন্তানদের উপস্থিতিতে পরম সাহসী মহাবীরও ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। নারী শিশুরা নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গেলে আমরা প্রথমতঃ ইজ্জত-আব্রু রক্ষা করার দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হবো। তারপর বাকী থাকলো আমাদের জান। যা আল্লাহর মর্জি তাই হবে, এ নিয়ে কেউ দুশ্চিন্তা করবেন না।

সময় সেদিন বয়ে চলেছিলো তীব্র গতিতে। সামরিক জওয়ানরা সমানে বাঁশি বাজিয়ে চলছিলো, বাসে উঠতে বলছিল সবাইকে। শেষতক আব্বা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে আম্মাকে বললেন, শেষ ব্যক্তিকে দারুল ইসলাম থেকে নিরাপদে পাকিস্তানে না পাঠানো পর্যন্ত আমি এখান থেকে যাব না। এটা শুনে দাদী বুঝে ফেললেন তার পুত্রের অবস্থান। পাহাড়ের মতো অনড়-অটল অবিচল লোকটিকে তার সিদ্ধান্ত থেকে ফেরানো যাবে না। দাদী তৎক্ষণাৎ নিজ কুরআন শরীফ গলায় ঝুলিয়ে ওযুর লোটা হাতে নিয়ে আম্মা ও বাচ্চাদের হাত ধরে বাসে গিয়ে উঠলেন। সেই বিদায়ের দৃশ্য ভোলা যায় না। আম্মার আর দাদীর ঠোঁট দুটো কাঁপছিল কি যেন এক অজানা আশংকায়, দু'গণ্ড বেয়ে নেমে এসেছিল সেদিন অশ্রুর প্লাবন। ইতস্ততঃ পদক্ষেপে পাণ্ডুর চেহারা নিয়ে তারা দুজনে আমাদের কোলে পিঠে করে হিজরতের বাসে চড়ে বসলেন। দাদী ও আম্মাকে বাসে চড়তে দেখে অন্যান্য বাড়ী ঘরের নারী ও শিশুরা সবাই দ্রুত এসে বাসে উঠে পড়লো। এবার অজানা ঠিকানা শ্বাপদসংকুল পথে চলতে শুরু করলো আমাদের বহনকারী বাসটি। বাস চলছিল আর বাসের দুপাশে পুরুষরা দৌঁড়াচ্ছিল, যেন তারা নিরাপত্তা দিতে চায় বাসকে। অনেক দূর পর্যন্ত দৌড়াতে দেখলাম পুরুষ লোকদেরকে। কিন্তু জানালা দিয়ে মাথা

www.pathagar.com

বের করে পিছনে দেখতে চাইলাম আব্বাকে। দেখলাম পাহাড়ের মতো অনড়-অটল অবিচল এক পুরুষ নির্বাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে, কি যেন বলতে চাচ্ছে সেই দুটো চোখ। অশ্রুহীন ভাষাহীন কিন্তু আবেগপূর্ণ চাহনী।

আসর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়ে বাস দুটো সার্না থেকে ছেড়ে এসে রাতের বেলা অমৃতসরে পৌঁছলো। সারারাত বাস অমৃতসরেই দাঁড়িয়ে থাকলো, কারণ রাতের বেলা ভ্রমণ ছিল বিপজ্জনক। গভীর রাতে দাদী ইস্তিনজার জন্য বাস থেকে নেমে গেলেন। সকলে দূরে যেতে বারণ করলো, কিন্তু তিনি চলে গেলেন। দাদী যাবার পর অনেক সময় পার হয়ে গেল। তাকে না আসতে দেখে আমরা চিন্তিত হয়ে পড়লাম। এক প্রকার নিরাশা ও হতাশা ছড়িয়ে পড়লো আমাদের মাঝে। এমন সময় এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটলো। অন্ধকারের মধ্যে দু-জন শিখ দাদীকে নিয়ে আসছে আর বলছে আম্মাজী দেখুন তো আপনাদের বাস কোনটি। আমরা তাকে দেখে চিৎকার করে ডাকলাম। এরপর তিনি আমাদের বাসে এসে আবার বসলেন। শিখ দুজন সালাম করে চলে গেল। যাবার সময় একজন পানি ভর্তি একটি পাত্র দিয়ে গেল। পরে দাদী আমাদের বলেছিলেন, "তোমরা খামাখাই বল শিখরা মারে" কোথায় ? দেখো তো শিখ দুটো কত ভালো।

আব্বাজান সতর্কতা স্বরূপ আমাদের রাহবার হিসেবে জামায়াতের একজন মুরুব্বী ব্যক্তি মাওলানা আবদুল জব্বার গাজী সাহেবকে (মৃত্যু ১৯৮১) বাস দুটোর সাথে প্রেরণ করেন। তাকে বলে দেন যে বাস সরাসরি লাহোরের গোয়ালা মন্ডিতে মালিক নাসরুল্লাহ খান আযীযের বাড়ীতে গিয়ে থামবে। তারপর টমটম গাড়ীতে করে আমাদের ইসলামিয়া পার্কের নিকট মৌলভী জাফর ইকবাল সাহেবের (মৃত্যুঃ ৫মে ১৯৮৫) বাসায় পৌঁছে দিতে হবে। এভাবেই অন্যান্য মহিলা ও শিশুদের নিজ নিজ আত্মীয়-স্বজনদের বাসায় পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। ইসলামিয়া পার্কের নিকট ফাসীহ মনযিল ছিল জাফর ইকবাল সাহেবের বাসা। আমরা সেখানে বেশ কয়েকদিন অবস্থান করলাম। এ সময়ের মধ্যে আমরা আব্বার কাছ থেকে কোনো ধরনের খবর পাইনি, তিনি কেমন আছেন আর কিভাবে আছেন ? দাদী ও আম্মার দিন তখন কাটতো কঠিন দুশ্চিন্তায়, প্রতিটি দিন এক একটি শতাব্দীর মতো মনে হতো আর রাতগুলো ছিল যেন কিয়ামতের তমসাচ্ছন্ন রাত। এ ক'দিন অবস্থানকালে মৌলভী জাফর ইকবাল সাহেবের পরিবারবর্গের আচরণ ছিল অতুলনীয়। আমাদের দেখাশোনা, খাওয়া-দাওয়া ও ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা তারা যেভাবে করেছেন তা আমাদের মদীনার আনসার ভাইদের কথাই মনে করিয়ে দিয়েছিলো সেই দিনগুলো।

www.pathagar.com

## সোহান লাল কলেজ ভবন লাহোর : ১৯৪৭ সাল

দারুল ইসলাম পাঠানকোট থেকে ১৯৪৭ সালে যখন আমরা হিজরত করে লাহোরে এসে পৌঁছি তখন নিয়ম অনুযায়ী দারুল ইসলামের জায়গাজমির বিনিময়ে আমাদের (অর্থাৎ জামায়াতে ইসলামীকে) সোহান লাল কলেজ ভবনটি বরাদ্দ দেয়া হয়। পাঠানকোটে আমাদের ঘর আর জ ামায়াতের অফিস ছিল একত্রে। এ কলেজের প্রিন্সিপালের কোয়ার্টারে আমরা গিয়ে উঠলাম। সেখানে উঠে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম। ডাইনিং টেবিলে চায়ের কাপে কয়েকদিনে চা শুকিয়ে কালো হয়ে গেছে, রান্না ঘরে গুলানো জমাটবদ্ধ আটা পাথরের মত শক্ত, ঘরের আলমারির দরজাগুলো এলোপাতাড়ি খোলা, মালপত্র, ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে আছে। এ দৃশ্য চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না, বুঝানো যাবে না লিখে। দেখে মনে হলো যেন এ গৃহবাসী চা-পান করার সময় আকস্মিক এ ঘর ছেড়ে চলে যান। অথবা যেতে বাধ্য হন। ঘরে ঢুকেই দাদী অত্যন্ত শক্তভাবে আমাদের সতর্ক করে বললেন, যে মাল-সম্পদ নিজ মালিকের কোনো কাজে আসলো না, তা আমাদের উপকার করবে কিভাবে। এ ঘরের কোনো একটি জিনিসের উপর হাত লাগাবে না কিন্তু, খবরদার!

আমরা প্রায় দুমাস এ ভবনে বসবাস করি। এ সময়েই আল্লামা মুহাম্মদ আসাদের বেগম তার পুত্রসহ আমাদের সাথে দেখা করতে আসেন। এ ভবনের তিনতলায় উঠে আমরা কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ৩০ অক্টোবর ১৯৪৭ সালের ঐতিহাসিক ভাষণ শুনেছিলাম। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে পাকিস্তানের স্বাধীনতার পর এটা ছিল তার প্রথম ভাষণ।

দেশ বিভাগোত্তর এ সময়ে আব্বা চৌধুরী মুহাম্মদ আলীর (পরবর্তীতে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী) সাথে সাক্ষাত করে বলেন, "মুসলিম লীগের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের মুখে আজ শোনা যাচ্ছে তারা পাকিস্তানকে একটি স্যেকুলার রাষ্ট্র বানাতে চান। ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে পাকিস্তান চালাতে চান। এটা তো লাখ লাখ মুসলমানের কাটাঘায়ে লবণ দেয়ার মতো কাজ। আর যে মহান উদ্দেশ্যের জন্য লাখ লাখ মুসলমান নর-নারী জানমাল, ইজ্জত-সম্ভ্রম বিসর্জন দিয়েছিল তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার শামিল।" এরপর তিনি চৌধুরী মুহাম্মদ আলী সাহেবকে লাহোর রেল স্টেশনে বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে থাকা মুসলমানদের লাশগুলোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে

www.pathagar.com

বলেন, বিভিন্ন জানোয়ার সেদিন এ লাশগুলোর অবমাননা করছিল। (কারণ সেদিন যাদের দায়িত্ব ছিল দাফন কাফনের ব্যবস্থা করার, তারা ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল হিন্দু আর শিখদের পরিত্যক্ত বাড়ীঘর দখলে লুটপাটে মত্ত।)

আব্বা তাকে আরো বলেন, এই কিছুদিন পূর্বেই সিমলা থেকে সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বহনকারী একটি ট্রেন লাহোরে এসে পৌছে , যে ট্রেনে একজন মানুষও জীবিত ছিল না, ট্রেনটির দরজা জানালায় জমাটবদ্ধ রক্ত লেগে ছিল। তখনও মুসলিম তরুণীরা শিখদের দন্তনখর থেকে বেঁচে আসতে পরেনি, তখন শহীদানের লাশগুলো দাফন-কাফন বিহীন পড়েছিল আর পাকিস্তানকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পারিণত করার ষড়যন্ত্র মঞ্চস্থ হচ্ছে। এসব লাখ লাখ মুসলিম নর-নারী জানমাল, ইজ্জত-সম্ভ্রম বিসর্জন দিয়ে নিজেদের বাপ-দাদার ভিটেমাটি ছেড়ে এসেছিল এ জন্য যে আপনারা শ্লোগান দিয়েছিলেন "পাকিস্তানের উৎস কি? লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ"। এসব নাম না জানা মুসলিম নারী-পুরুষ, শিশু জিহাদী অনুপ্রেরণায় শাহাদাতের পূর্ণ পাত্র পান করেছিল কি পাকিস্তানকে ধর্মনিপেক্ষ রাষ্ট্র বানানোর জন্য ?"

সব কথা শুনে চৌধুরী মুহাম্মদ আলী বললেন, 'আপনার এ বক্তব্য আমি প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের নিকট পেশ করবো। যাই হোক এসব বক্তব্যের ফল যা হবার, তাই হলো। পাকিস্তান সরকার আমাদের জন্য বরাদ্দকৃত বাসাটি অন্য এক ব্যক্তির নামে বরাদ্দ দিয়ে তাকে অবিলম্বে দখল নেয়ার নির্দেশ জারি করে দিল। আব্বাজান কোনো ধরনের বিতর্কে না গিয়ে দিনের মধ্যে সোহান লাল কলেজের ভবনটি ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন। মাগরিবের কিছু পূর্বে তিনি দুটো টমটম নিয়ে আসলেন। তারপর আম্মা ও দাদীকে ডেকে বললেন, "আপনারা তৈরি হয়ে যান। আমরা দারুল ইসলাম পাঠানকোট থেকে যে জিনিসপত্র সঙ্গে এনেছি, শুধুমাত্র সেগুলো সাথে নিয়ে বাচ্চাদের নিয়ে টমটম দুটোতে উঠে বসুন।"

যেমন কথা তেমন কাজ। এবার আম্মা দাদী কেউ আপত্তি করলেন না। তারা কেউ জিজ্ঞেসও করলেন না যে, হিন্দুস্থান থেকে হিজরত করেই তো এখানে আসলাম, এখন আবার কোথায় যাব ? কেন ? কি জন্য ? কারণ কি? এ ধরনের প্রশ্ন করার রেওয়াজ আমাদের পরিবারে কখনই ছিল না। আব্বাজান যে সিদ্ধান্ত দিতেন, সকলে বিনা বাক্য ব্যয়ে তাই মেনে নিত। তারা দুজন নীরবে নিজেদের যা আমরা দারুল ইসলাম থেকে নিয়ে এসেছিলাম সেসব ব্যবহার্য বস্তু বাঁধতে শুরু করলেন। আমরা বাচ্চারা কিছু খেলনাপত্র হাতে নিয়ে রওয়ানা দিচ্ছিলাম। কিন্তু দাদী সব খেলনা



www.pathagar.com

আমাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে মাটিতে রেখে দিলেন। এরপর বললেন তোমরা তোমাদের বাবাকে দেখছো না ; যে, তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, এখান থেকে কোনো জিনিস সাথে নিবে না, যা তোমরা সাথে করে আনোনি।

মাত্র দেড় মাসের আবাসন ছেড়ে আমরা বের হলাম। টমটম গাড়ীতে গিয়ে বসলাম। অন্যরাও আমাদের মতই মালপত্র গুছিয়ে টমটম গাড়ীতে গিয়ে উঠলো। এবার এ কাফেলা চলা শুরু করলো লাহোর শহরের ইসলামিয়া পার্কের দিকে। সেখানে পৌছে দেখি জামায়াতের কর্মীরা পূর্ব থেকে তাবু নিয়ে হাজির। দেখতে দেখতে ক্যাম্প তৈরী হয়ে গেল। এ ক্যাম্পে আমরা প্রায় আড়াই মাস অবস্থান করে ইছরায় ভাড়া করা বাড়ীতে চলে আসি। এ ঘটনার ঠিক পরদিন আব্বা পূর্বতন বরাদ্দ ভবনটির চাবি সরকারের নিকট ফিরিয়ে দেন।

আব্বাজান যেভাবে নিজস্ব জমি জমার বিনিময়ে বরাদ্দ পাওয়া একটি বাসা কোনো ধরনের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত না করেই ছেড়ে দিলেন, বর্তমান সময়ে এ ধরনের উদাহরণ পাওয়া মুশকিল।

সেদিন থেকেই আমাদের মন মস্তিষ্কে একটি বিষয় বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, সম্মানের কুঁড়েঘর অপমানের রাজপ্রাসাদ থেকে উত্তম। আল্লাহর মেহেরবানীতে আমরা সেই কঠিনতর দিনগুলোও পার করলাম।

এ কঠিনতর দিনগুলোতে আব্বা জামায়াত কর্মীদের নিয়ে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন। কাজটি ছিল নাম না জানা শহীদদের লাশ কাফন-দাফনের কাজ। এখানে উল্লেখ্য, সমগ্র ভারতবর্ষের দূর-দূরান্ত থেকে পশ্চিম পাকিস্তান অভিমুখী মুহাজির মুসলমানদের জন্য সহজতর পথ ছিল ট্রেনযোগে অমৃতসর হয়ে লাহোর পৌছা। পূর্ব পাঞ্জাবের অমৃতসর শিখ প্রধান শহর হবার কারণে পাকিস্তানগামী প্রতিটি ট্রেন ১৯৪৭ সালের বিভীষিকাময় দিনগুলোতে সেখানকার স্টেশনে থামা মাত্রই ট্রেনযাত্রীরা গণহত্যার শিকার হতেন হিন্দু ও শিখদের দ্বারা। ভারত থেকে ট্রেন ভর্তি লাশ আসতো লাহোরের রেল স্টেশনে। লাহোর স্টেশনে আগত ট্রেনযাত্রী শহীদানের লাশ দাফনের জন্য জামায়াত কর্মীরা দুগ্রুপে বিভক্ত হলেন। লাশ পরিবহনের জন্য ট্রাক ভাড়া করা হলো। একটি গ্রুপ সামনাবাদ এলাকায় গণকবর খোড়ার কাজ করতো এবং অন্য গ্রুপ স্টেশন থেকে শহীদদের লাশ বহন করে আনতো। শহীদদের আনার পর জানাযা অনুষ্ঠিত হতো এবং এরপর গণকবরে সকলকে দাফন করা হতো। কয়েক সপ্তাহ ধরে চলে এ কার্যক্রম।

www.pathagar.com

আমাদের শৈশব তখনও পার হয়নি। তাই আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম জানাযা-কাফন-দাফনের কার্যক্রম। অনেকবার মুরুব্বীরা আমাদের তাড়িয়ে দিতেন, তারা বলতেন যে, বাচ্চারা লাশ দেখে না। লাশ দেখলে রাতে ভয় পাবে। কিন্তু আমরা লাশ দেখেও ভয় পেতাম না। কারণ দারুল ইসলাম থেকেই আমরা লাশের পর লাশ দেখে আসছিলাম। কারণ ১৯৪৭ সালের সেই দিনগুলোতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হাজার হাজার মানুষ খুন হচ্ছিল আর হাজার হাজার মা-বোন হারাচ্ছিল ইজ্জত-আব্রু। আর শ্বাপদসংকুল পূর্ব পাঞ্জাবের বিশাল পথ পাড়ি দিয়েই আমরা পাঠনকোট থেকে লাহোরে আসি। তাই লাশ দেখে আতংকিত হবার বিষয়টি আমাদের মন থেকে বেমালুম উবে যায়।

শহীদানের লাশ দাফনের কাজ সমাপ্তির পর আব্বা জামায়াত কর্মীদের নিয়ে মুহাজির মুসলমানদের সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। আমরাও মুহাজির হিসেবেই পাকিস্তানে এসেছিলাম। উল্লেখ্য ইসলামে হিজরত করে নিজেদের ঘর-বাড়ী ত্যাগ করে দীনের জন্য অন্য দেশ বা রাষ্ট্রে গমনকারীকে (হিজতরাকারীকে) মুহাজির বলা হয়। মুহাজিরদের সেবায় একটি গ্রুপ সীমান্তে নিয়োজিত হয় এবং অপর গ্রুপটি ওয়ালটন ও বাউলী ক্যাম্পে আশ্রিত মুহাজিরদের সেবায় আত্মনিয়োগ করে। অন্যদিকে এ সময় দুষ্ট লোকেরা সরকারী কর্মচারীদের সহায়তায় লুটের রাজ্য কায়েম করে। এতে কিছু সেচ্ছাসেবকও যোগ দেয়। রিলিফের লেপ-তোষক, কম্বল খাদ্যদ্রব্য আত্মসাতের ঘটনা ঘটে স্বেচ্ছাসেবকদের দ্বারা। সেই তরুণী যুবতী ও নারীদের কাহিনী আরও বেদনাদায়ক যারা হিন্দু-শিখদের দন্ত-নখর থেকে বেঁচে আসতে পারলেও পাকিস্তানে এসে রেহাই পায়নি। কেউ পিতা-মাতাকে হারিয়েছে, কেউ পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে কেউ বা জানটি নিয়ে আশ্রয় লাভ করতে এসেছিল নব্য স্বাধীন রাষ্ট্র পাকিস্তানে। এ অসহায় কন্যা-জায়া-জননীরা যখন তাদের দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করতো তখন হৃদয় ডুকরে কেঁদে উঠতো। এ ধরনের অনেক খবর সেদিনের পত্রিকাগুলোর পাতায়ও ঠাঁই পেয়েছিল। অনেক মযলুম মুসলমান তরুণীকে দেখেছি আব্বাজানের কাছে এসে ফরিয়াদ করে বলেছে, যদি পাকিস্তানে এসেও আমাদের ইজ্জত আব্রুর নিরাপত্তা না পাই, তাহলে আমরা যাবো কোথায় ?

ভারত থেকে পালিয়ে আসা মুসলিম যুবতীরাও আশ্রয় শিবিরগুলোতে ঠাঁই পেতে থাকে। আম্মার নিকট সেটা ছিল যুগের চরম বেদনাদায়ক অধ্যায়। অধিকাংশ যুবতীর আপাদমস্তক ছিল নরপশুদের আঘাতে

www.pathagar.com

ক্ষতবিক্ষত। আজো চোখে ভেসে উঠে এমন একটি মেয়ের কথা যার একটি চোখ এক শিখ কৃপাণের আঘাতে নষ্ট করে দেয়। আরো একটি মেয়ে যার অনেক নাদুস-নুদস শরীর ছিল জানোয়ারের দন্ত-নখরে বিধ্বস্ত। এছাড়াও এমন অনেক আঘাতের চিহ্ন আছে, অনেক কাহিনী আছে যা লেখা যায় না, বলা যায় না, শোনা যায় না, সহ্যও করা যায় না–। এতোসব অসহনীয় দুঃখকষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল সেদিন ভারতের মুসলমান মা-বোনদের। ইসলামের জন্য নিজ মাতৃভূমি ত্যাগ করে অন্যদেশে যাবার সময়ও কত শত মা-বোনকে যে অপমানের জ্বালা সইতে হয়েছে তার হিসাব হয়তো কোনোদিন পাওয়া যাবে না। যার পরিসংখ্যান কোনোদিন পাওয়া যাবে না। এদেরই কয়েকজন কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বলেছিল, শিখরা আমাদের শরাব পান করতে বাধ্য করতো, এরপর তাদের সামনে নাচতে বলতো।' এ যুবতীরা তাদের উপর শিখ নরপশুদের বর্বরতার কাহিনী বলার জন্য ছিল উদগ্রীব। তারা মনে করতো হয়তো এতে তাদের চাপা ক্ষোভ কিছুটা প্রশমিত হবে। যখন তারা এ লোমহর্ষক নির্যাতনের বর্ণনা দিত আমরা দাদী ও আম্মার নিকটই থাকতাম। এসব বলার সময় আর কাপড় তুলে আঘাতের চিহ্ন দেখানোর সময় তারা একেবারেই ভুলে যেত আমার মতো কম বয়সী একটি বালিকা ওদের সামনে বসে আছে। এ সময় আম্মার অবস্থা আমি বর্ণনা করতে পারবো না।

১৯৪৭ সালে শিখদের নির্যাতনের শিকার এমনি এক মহিলার সাথে আজো আমার সম্পর্ক আছে। তার বাসায় আসা যাওয়া আছে। আজ তার পুত্ররা বড় বড় পদে চাকুরি করছেন কিন্তু তিনি আজ ডিপ্রেশনের রোগী। বিশেষভাবে তার এ রোগ বেড়ে যায় আগস্ট মাসে। গত বছর ১৪ আগস্ট তিনি আমাকে ফোন করে দাওয়াত দেন। বিভিন্ন আলাপ চারিতার এক পর্যায়ে তিনি বলা শুরু করলেন, তার দুঃখের পাণ্ডুলিপি। "জীবন পার করে দিলাম লাহোরের মডেল টাউনের এ বাড়ীতে। কিন্তু যখনই স্বপ্ন দেখি আমার চোখে ভেসে উঠে লুধিয়ানার সেই বাড়ীটি, দাঙ্গাবাজ শিখদের দেয়া আগুনে আমাদের বাড়ী জ্বলছে, বাড়ীর উঠানে পড়ে আছে বাবার মৃতদেহ, বড় বোনকে শিখগুণ্ডারা টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে, এরপর এক শিখ যাকে আমি চাচাজী বলতাম আমার উপর হামলে পড়তেই আমি ভয়ে বেহুশ হয়ে যাই। পরে জানতে পারি গণধর্ষণের শিকার হয়ে আমার বড় বোন মারা যায়। নিজের উপর রাগ হয়, আমি এতো বেহায়া আর নির্লজ্জ যে আমি মরলাম না। প্রতিবছর ১৪ আগস্ট পাকিস্তান জুড়ে এতো আলোকসজ্জা হয় এবং রেডিও টিভিতে এতো গান বাজনা হয়, ছেলেরা

www.pathagar.com

বড় লম্বা চুল রেখে নাচানাচি করে এ আনন্দ করা হয় স্বাধীনতার জন্য। পাকিস্তানের স্বাধীনতার যে চরম মূল্য দিতে হয়েছে আমাদের তা আমাকে জিজ্ঞেস করো। স্বাধীন দেশের গায়ক বাদকরা কি বুঝবে গণধর্ষণের শিকারে তরুণীদের অবস্থা কি হয়েছিল। বিশ্বাস করো পাকিস্তানীরা স্বাধীনতার মূল্য বুঝে না। যে হিন্দু-শিখদের সাথে আজ তারা সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি স্থাপন করে গদগদ হচ্ছে, সে শিখ ও হিন্দু মহল্লাবাসীদের আমরাও আপাজী, মামাজী আর চাচাজী বলে সম্বোধন করতাম।"

এরপর তিনি আরো বলেন, "বিশ্বাস করো ১৪ আগস্টের উৎসবমুখর আলোকসজ্জা আমার অন্তরের ক্ষতকে কঠিন ও গভীর করে দেয় আর মনের অন্ধকারকে আরো বাড়িয়ে দেয়। আমার যে বড় বোনের চেহারা পর্যন্ত কোনো পরপুরুষ দেখেনি সে কিনা শুধুমাত্র মুসলমান হবার অপরাধে হাজার বছরের প্রতিবেশী শিখ-হিন্দু নরপশুদের গণধর্ষণের শিকার হলো। আমরা সেদিন কেন এতো ত্যাগ স্বীকার করেছিলাম ?"

তার কথা শুনে আমি সেদিন নির্বাক হয়ে যাই। তিনি তার ক্ষোভ প্রকাশ করছিলেন, কিন্তু তার পরিবারের সদস্যরা আজ 'লুধিয়ানা' নামটিই শুনতে চায় না। শুনতে চায় না মা-খালার উপর পাষণ্ড বর্বর শিখ-নরপশুদের অপকীর্তি। মানুষ এসব ভুলে থাকতে চায়, গোপন করতে চায়। কিন্তু দেহ ও মনে একত্রে আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তি কিভাবে ভুলবে তার আহত হবার কথা। তবে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে আমি যখন তার বাসায় যেতাম তখন তার নাতি-নাতরীরা আমাকে দেখেই শ্লোগান দিয়ে উঠতো "লুধিয়ানা জিন্দাবাদ।"

এ ধরনের পরিবার বিচ্ছিন্ন নিরাশ্রয় অসহায় তরুণী ও যুবতীদের দূর ও নিকটাত্মীয়দের নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানে খুঁজে বের করা ছিল এক অতীব কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তদুপরি একটু ভেবে দেখুন। সেই মুহূর্তগুলোর কথা। কতই না বেদনাদায়ক ও লোমহর্ষক ছিল সেই মুহূর্তগুলো যখন পরিচিত পরিজন পাওয়ার পরও তারা আপন বোন, কন্যাকে চিনতে চাইতো না এবং সাথে নিয়ে যেতে পুরোপুরি অস্বীকার করতো। তখন এ নিরাশ্রয় অসহায় মজলুম যুবতীদের গগণবিদারী আর্তচিৎকারে ভারী হয়ে উঠতো পুরো শরণার্থী শিবিরের পরিবেশ। তারা সমগ্র শক্তি দিয়ে চিৎকার করে আপন ভ্রাতা-পিতা-পরিজনের জন্য বদ দোয়া দিত। এসব কথা মনে হলে আজও অন্তর কেঁপে উঠে। আব্বাজান ও তার অন্যান্য সঙ্গী সাথীরা এমন অসংখ্য যুবতীর জন্য বর খোঁজ করে বিয়ের ব্যবস্থা করেন।

www.pathagar.com

এ সকল সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি আব্বাজান আদর্শ প্রস্তাব পাস করানোর জন্য সরকারের নিকট জোর দাবী জানান। এ জন্য তিনি পাকিস্তানের প্রতিটি প্রান্তে ছুটে যান। পাকিস্তানে ইসলামী শাসন কায়েমের জন্য তিনি রেডিও পাকিস্তানের মাধ্যমে বক্তব্য প্রচার করেন এবং ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসে লাহোর আইন কলেজে বক্তৃতায় দাবী করেন যে, পাকিস্তানের শাসনব্যবস্থা ইসলামী হতে হবে। এছাড়া প্রশাসনের অযোগ্যতা, অদক্ষতা, শরণার্থী শিবিরগুলোতে স্বেচ্ছাসেবকদের লুটপাট ও জুলুমবাজীর বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার হয়ে উঠেন। সরকারের এহেন সমালোচনা তাঁকে সরকারের এক নম্বর দুশমনে পরিণত করে। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান তার গদি রক্ষার জন্য, স্যেকুলার গোষ্ঠী নিজেদের গোষ্ঠী স্বার্থে জামায়াতের বিরুদ্ধে নগ্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তারা আব্বার বিরুদ্ধে ও জামায়াতের বিরুদ্ধে যুগপৎ অপপ্রচার প্রোপাগাণ্ডার রামরাজ্য কায়েম করে বসে। লিয়াকত আলী খান সাংবাদিকদের প্রেস কনফারেন্সে বলেন, "মাওলানা মওদূদী পাকিস্তানের আমীরুল মোমেনীন হতে চান।" অথচ তিনি ভারত থেকে বাড়ী-ঘর ছেড়ে আসা মুহাজিরদের অধিকার আদায়, সরকারের ছত্রছায়ায় পরিচালিত লুটপাট বন্ধ করার দাবী জানান। আর জনগণের সাথে মুসলিম লীগ নেতাদের করা ওয়াদা পূর্ণ করার দাবী করেন।

আব্বাজান এ সময় প্রকাশ্যে বলেন, "ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হবে এ উদ্দেশ্যে মুসলিম লীগ উপমহাদেশে স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক আবাসভূমির দাবী তুলেছিল। 'পাকিস্তানের উৎস কি ?–লা–ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' এ জনপ্রিয় শ্লোগানকে গণপরিষদ যদি রাষ্ট্রের বিশ্বাস-আদর্শ ও লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ না করে তাহলে এটা হবে পাক-ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদের সাথে প্রকাশ্য বিশ্বাসঘাতকার শামিল।" ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়নের লক্ষে তিনি দীনি ও রাজনৈতিক মহলে আদর্শ প্রস্তাবের ধারণা দেন। আদর্শ প্রস্তাবের মুখ্য বিষয় ছিল আল্লাহর সার্বভৌমত্ব।

এ আদর্শ প্রস্তাবের ধারণাকে প্রস্তাব আকারে পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদে পাস করানোর জন্য যে দুজন ব্যক্তি মুখ্য অবদান রাখেন তারা হলেন প্রথম গণপরিষদ সদস্য মাওলানা শাব্বির আহমদ ওসমানী (মৃত্যু : ১৩ ডিসেম্বর ১৯৪৯) এবং মাওলানা জাফর আহমদ আনসারী (মৃত্যু : ২০ ডিসেম্বর ১৯৯১)। তারা উভয়েই মুসলিম লীগের টিকিটে গণপরিষদে নির্বাচিত হন। অন্যদিকে মুসলিম লীগের অপরাপর অনেক

www.pathagar.com

গণপরিষদ সদস্য আদর্শ প্রস্তাব গ্রহণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। আদর্শ প্রস্তাব পাস্ করানোর জন্য সংগ্রাম করে এটাকে গণপরিষদ কর্তৃক পাস করানো ছিল আব্বার একটি অন্যতম সাফল্য।

যখন পাকিস্তানকে একটি সেকুলার রাষ্ট্রে পরিণত করার ষড়যন্ত্র শুরু হয় তখনও আব্বা প্রকাশ্যে ঘোষণা দেন, "এটা মুহাম্মদ স. আল্ আরাবীর উম্মতের দেশ, এটা কালমার্কস ও মাওসেতুং-এর জাতির দেশ নয়। যদি আল্লাহর দীনের খাতিরে লড়তে হয় তাহলে আমরা যুগপত দশ দশটি ক্ষেত্রে লড়াই করতে প্রস্তুত। একই সাথে আমরা স্বৈরাচার ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের সাথে লড়ে যাবো যতদিন আমরা বেঁচে আছি, আর যতক্ষণ আমাদের ঘাড়ের উপর মাথা থাকবে ততক্ষণ কারো সাহস নেই যে, এ দেশে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো জীবনব্যবস্থা চালু করে।"

* * *

www.pathagar.com

# কারাবরণের সূচনা : আম্মার ধৈর্য ও দাদীর শিক্ষা

কিছু ব্যক্তি আমাদের সমাজে এমন আছেন যারা ব্যক্তি হয়েও শুধুমাত্র ব্যক্তি নন প্রতিষ্ঠান। তাদের তুলনা ছায়া সুনিবিড়বৃক্ষের মতো। ছায়াদানকারী বিশাল বৃক্ষ যেমন ছেলে-বুড়ো, আমীর-গরীব সবাইকে ছায়ায় আশ্রয় দেয়, তেমনি ফলবতী বৃক্ষ নিজ ফলফলাদি দিয়ে মানুষ, পশু-পাখী, পোকা-মাকড়, নির্বিশেষে সবাইকে সন্তুষ্ট করে। কাউকে বঞ্চিত করে না। আমাদের আম্মাজান (বেগম মওদূদী) এমনি এক ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী মহিলা ছিলেন। তিনি যুগপৎ 'বাবা' ও 'মা'-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে আমাদের 'নয়' ভাই-বোনকে মানুষ করেছেন।

আমাদের আব্বা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ.-এর কারণে আমাদের ঘরদোর সদাসর্বদা জনাকীর্ণ থাকতো। বাইরে পুরুষ আর অন্দরমহলে মহিলাদের আনাগোনা চলতো সারাদিন। জুমুআর দিন মহিলাদের জুমুআর নামাযের আয়োজন হতো আমাদের বাসায়। এ দৃশ্য আমরা দেখে এসেছি ছেলেবেলা থেকেই। এজন্য সামষ্টিক জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে আমরা অভ্যস্ত হয়ে উঠি শুরু থেকেই।

জীবনের ফেলে আসা দিনগুলোর স্মৃতি যখন রোমন্থন করি তখন আজও একটি দৃশ্য চোখে ভাসতেই স্তম্ভিত হয়ে পড়ি। তখন রাতের বেলা। আমি এতো ছোট যে, কয়টা বাজে খেয়াল করতে পারছি না। আম্মাজান আমাদের সব ছোট ছোট ভাই-বোনদের ধরে জড়োসড়ো দাঁড়িয়ে একটি কামরায়। দুজন মহিলা পুলিশ কনষ্টেবল এসে আম্মার দেহ তল্লাশী করলো, তারপর চললো গৃহ তল্লাশী। আব্বার কাপড়-চোপড় একটি সুটকেসে সাজানো আর কোথাও যাবার জন্য তিনি দাঁড়িয়ে প্রস্তুত। তারপর আব্বা হঠাৎ একটু জোর গলায় বললেন, 'আস্‌সালামু আলাইকুম' খোদা হাফেজ, ফী আমানিল্লাহ' একথাগুলো বলে পেছন ফিরে না দেখেই আব্বা জোর কদমে পুলিশের সাথে কোথায় যেন চলে গেলেন। এ ঘটনার তারিখ ৪ অক্টোবর ১৯৪৮ সাল, আব্বার কারাবরণের প্রথম ঘটনা। আমার বয়স তখন আট বছর।

পরবর্তীতে আমি একদিন আম্মাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "আব্বা যাবার সময় পিছন ফিরে আমাদের দিকে তাকালেন না কেন ?"সেদিন আম্মা খুবই সন্তুষ্টির সাথে এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন এই বলে, "হযরত ইবরাহীম আ. মক্কা শরীফ থেকে চলে যাবার সময় বিবি হাজেরা

www.pathagar.com

আ. ও হযরত ইসমাঈল আ.-এর দিকে ফিরে তাকাননি। পিছনের দিকে ফিরে দেখলে লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সিদ্ধান্ত শক্তিতে দুর্বলতা চলে আসে।" আম্মা আমাদের সুযোগ মতো আম্বিয়াকেরামের আ. বিভিন্ন কিস্‌সা শোনাতেন তাই প্রশ্নের উত্তরের ইশারাতেই মূল বক্তব্য বুঝে ফেলি সেদিন।

যখন আব্বা গ্রেফতার হলেন তখন ঘরে খুব কম টাকা পয়সা ছিল, যা দিয়ে চলা যায়না। এজন্য আম্মাজান জীবনের পুরো পদ্ধতি বদলে দিলেন। ঘরের সমস্ত কাপড় নিজ হাতে ধোয়া শুরু করলেন। অথচ তিনি দিল্লীর এমন এক অভিজাত ঘরের মেয়ে ছিলেন, যে ঘরের মেয়েরা একটি রুমালও নিজ হাতে পরিষ্কার করতো না। বাবুর্চিকে বিদায় করে দিলেন, আর নিজেই রান্না-বাজার-সদাই করতে শুরু করলেন। এ দিনগুলোতে একজন হত দরিদ্র মহিলা জুমুআ পড়তে আমাদের এখানে আসতেন। তিনি ছিলেন বিধবা আর তার ভাই ঘোড়া গাড়ী চালাতো। তিনি অতীব আগ্রহ ভরে আমাদের বাসায় এসে থাকা শুরু করলেন ও গৃহস্থালির কাজের সমস্ত দায়-দায়িত্ব নিজের কাধে তুলে নিলেন। সেই অশিক্ষিত মহিলা আম্মাকে বললেন, "আপনি আল্লাহর কাজ করে যান, আপনার ঘরের সব কাজ আমি করে দিব।" তার নাম ছিল ভাগ্যভারী (অর্থ ভাগ্যবতী) এ নাম আমাদের বুঝে আসতো না বলে আমরা তাকে 'রাসভরি' বলে ডাকতাম। এতে তিনি কোনোদিন আপত্তি করেননি।

আমাদের আম্মা সবসময় "ইয়া হাইয়্যু, ইয়া কাইয়্যুম, বিরাহমাতিকা আসতাগিসু" দোয়াটি পড়তেন। একদিন আম্মা খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তিনি হাঁপানী রোগী ছিলেন। রোগ খুব বেড়ে যাবার পর অতি কষ্টের মধ্যে তিনি বললেন, "আমার স্বামী জেলে, আমার কিছু হয়ে গেলে বাচ্চারা শুধু কাঁদবে, ওদের সান্ত্বনা দেবারও কেউ থাকবে না।" একথা শুনে দাদী খুব নারাজ হয়ে বললেন, "কেন এতো হতাশার কথা বলো, সাহস রাখ, আত্মবিশ্বাসী হও, সামান্য একটু শ্বাসের ব্যাপারেই এত বিচলিত।"

আমাদের দাদী অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী ও সাহসী নারী ছিলেন। তিনি আম্মাকে নসিহত করে বলতেন, "বাচ্চাদের এমনভাবে গড়ে তোল যাতে করে তারা ক্ষুধা-দারিদ্র্য এবং ধন-ঐশ্বর্য্য সকল অবস্থাতেই মানিয়ে চলতে পারে। একবেলা পোলাও কোরমা খাওয়ালে অন্যবেলা ডাল রুটি বা চাটনি রুটি খাওয়াবে। বাচ্চাদের কখনো একই ধরনের খাবার দিবে না, তাহলে ওরা যা চাইবে তাই দিতে হবে। মা-বাবা খুব সহজেই শিশুর অভ্যাস খারাপ করে ফেলে, কিন্তু বাস্তবতা কারো তোয়াক্কা করে না। কারণ বাস্তব বড় নির্মম সত্য, এতো বড় বড় ব্যক্তিত্বকেও ছাড়ে না।" দাদী

www.pathagar.com

আরো বললেন, আমি আমার সন্তানদের এভাবেই লালন-পালন করেছি। একবেলা খুব ভালো খাবার দিয়ে অন্য বেলা শুধু চাটনী-ভর্তা দিয়ে রুটি খাইয়েছি।

দাদীর এ শিক্ষার প্রভাব দারুণভাবে পড়েছিল আব্বার জীবনে। হয়তো এজন্যই আব্বা দুঃখ-কষ্ট, হাসি-আনন্দ সকল অবস্থায় সকল ক্ষেত্রে দৃঢ়পদ থেকে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পেরেছিলেন। তার শারীরিক গঠন ও মানসিক স্থিতি ছিল অনড়, অটল, অবিচল। তিনি নিজের ছেঁড়া বোতাম নিজেই লাগাতেন। নিজের ছিঁড়ে যাওয়া কোর্তা পায়জামা নিজেই সেলাই রিপু করে নিতেন। এজন্য তার একটি জেল কিট (Jail Kit) ছিল, প্রথমবার কারাবরণের পর থেকে জেল কিট সদা প্রস্তুত থাকতো। সেটাতে সুঁই-সুতা ও বিভিন্ন সাইজের বোতাম রাখা থাকতো। আমাদের দাদী ছিলেন এক সাক্ষাত ওলীউল্লাহ। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে নিজের দৃষ্টি আকাশের দিকে তুলে বলতেন,"মান মারিযাম, তু-তাবিবাম" (অর্থ আমি রোগী আর তুমি আরোগ্য দানকারী) আশ্চর্য এরপর তিনি ভালো হয়ে যেতেন। জিন্দেগীতে তিনি কখনো কোনো চিকিৎসকের শরণাপন্ন হননি। কোনোদিন দাওয়াই বা ঔষধ খেতে দেখিনি। যদি কোনো ফোঁড়া বা ঘা হতো তাহলে সেস্থানে নিজের হাতকে রেখে বলতেন–

*"এয় যানবাল্ বুযুর্গ মাসু*
*খোদায়ে মা বুযুর্গতর আস্ত।"*

অর্থ : এই ফোড়া! বেশী বাড়িস না, আমার আল্লাহ সর্বশক্তিমান।

তিনি ছিলেন ফারসী সাহিত্যের পণ্ডিত। তিনি বেশীর ভাগ কথার জবাব ফারসী কবিতার মাধ্যমে দিতেন।

দাদী যে কোনো ঘরোয়া সমাবেশে হাজির হলে সে সভা শুধু তারই হয়ে যেত। তিনি থাকতে অন্য কোনো মহিলা কিছুই বলতে পারতেন না। সবাই তার কথা শুনতেন আর অপলক নয়নে তার দিকে তাকিয়ে থাকতেন। যেন তিনিই হয়ে উঠতেন প্রতিটি মাহফিলের প্রাণ। তার বক্তব্য ও কথাবার্তা এতো সুশীল ও শ্রুতিমধুর সাহিত্যিক ভাবপূর্ণ হতো যে, কেউ তার বক্তব্য শুনলে তার ভক্ত হয়ে যেতো। তিনি ছিলেন উপস্থিত বুদ্ধি সম্পন্ন এক তাৎক্ষণিক জবাব। তার হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য শ্রোতাদের হৃদয়ের মর্মমূলে গিয়ে পৌছতো। হাস্যরস ও কৌতুকের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন তুলনাহীন। কথা বলে সবাইকে হাসাতেন, কিন্তু নিজে থাকতেন স্বাভাবিক। সবাইকে হাসিয়ে নিজে কি সুন্দর চুপচাপ বসে আছেন, তার এ অবস্থা দেখে আমরা আরো বেশী হাসিতে লুটোপুটি খেতাম।

www.pathagar.com

আমার এক মামা কিং এডওয়ার্ড মেডিকেল কলেজ লাহোরে চিকিৎসা বিজ্ঞানে পড়তেন, তার নাম জালাল। তিনি একবার দাদীর সাথে শর্ত ঠিক করলেন যে তারা গদ্যে নয় পদ্যের মাধ্যমে কথা বলবেন। এক্ষেত্রে দাদীর কোনো সাহায্যকারী প্রয়োজন হলো না কিন্তু মামা বার বার আম্মার কাছে এসে এ কবিতা সে কবিতার নানা বিষয় জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। আম্মা যদি মামার সহযোগিতা করতেন তাহলে এতে শর্ত ভঙ্গ হয়ে যেতো, বিধায় আম্মা দাদীর অনুমতি নিয়ে নিলেন। দাদী খুশী মনে অনুমতি দিয়ে বললেন, ছোট মানুষ, কোনো গাইড লাইন চাইলে কোনো অসুবিধা নেই। তথাপি মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে মামা তার শর্তে হেরে গেলেন এবং কান ধরে দাদীর কাছে ক্ষমা চেয়ে বললেন, আমি আর কোনোদিন আপনার সাথে এমন শর্তারোপ করবো না। আম্মা প্রায়ই বলতেন, আমি আমার পুরো জীবনে তোমার দাদীর মতো কোনো নারী দেখিনি। এমন ব্যক্তি যেন তার মধ্যে প্রবৃত্তির কোন চাহিদাই নেই, আসলেও তার জীবনের কোনো চাহিদা ছিল না। দাদী প্রায়ই বলতেন সুফীদের বৈশিষ্ট্য হলো কামনাহীন জীবন।

আমরা আব্বা-আম্মা আর দাদীর জীবনের বৈশিষ্ট্য এ জিনিসগুলো দারুণভাবে পেয়েছি। সন্তুষ্টি ও সবরের এমন উঁচু স্তরে তারা আরোহণ করেন যা ছিল তুলনাহীন। আর এ গুণাবলী লালন করে তারা নফসে মুতমায়িন্না হয়ে গিয়েছিলেন। আম্মাজান প্রায়ই বলতেন আমি বাস্তবের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে শিখেছি তোমার দাদীর কাছ থেকে। এ বিবাহিত জীবনে তিনি আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় পুত্রবধু ও শাশুড়ীর মতের অমিল সাধারণত হতো না। যে কোনো বিষয়ে দুজন একই মত দিতেন।

আব্বার প্রথম কারাবরণের পর আমাদের সংসারে অভাব দেখা দিল। সংসারের খরচ চালাতে রীতিমত হিমসিম খেতে হলো আম্মাকে। তদুপরি তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, যে করেই হোক ছেলেমেয়েদের পড়ালেখার খরচ অবশ্যই চালিয়ে নিতে হবে। এজন্য তিনি আমাদের পরিচিত খুরশীদ খালাকে ডেকে কিছু গয়নাগাটি বিক্রির ব্যবস্থা করলেন। গয়না বিক্রির টাকা দিয়ে সন্তানদের শিক্ষা ও ভরণ-পোষণের কাজ অত্যন্ত সাবলীলভাবে চালিয়ে নেন আম্মা।

ঈদে কিংবা নিকটাত্মীয়দের বিয়ে শাদী উপলক্ষে নতুন কাপড় তৈরীর রেওয়াজ আমাদের পরিবারে ছিল না। ছেলেবেলার সেদিনগুলোতে আম্মা আমাদের ভালোভাবেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, যেহেতু রোযার মাসে

www.pathagar.com

যাকাত দিতে হয় এ জন্য ঈদুল ফিতরে নতুন কাপড় বানানো সম্ভব নয়। আর ঈদুল আযহা তো কুরবানীর ঈদ এ ঈদে তো কাপড় বানানোর প্রশ্নই উঠে না। তাই ধোপার ধোয়া কাপড় পরে ঈদের জামায়াতে হাজির হও। অনুরূপভাবে তিনি বলতেন, প্রত্যেক বিয়ে শাদীর জন্য কাপড় বানানো অর্থহীন।

একদিন ঘরে আটা শেষ হয়ে গেল। সন্ধ্যার সময় ছিল। আটা ভাঙ্গানোর কল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমাদের কাজের মহিলা পাশের বাড়ী থেকে সামান্য আটা চেয়ে আনে দিনের কাজ চালানোর জন্য। এ আটা দেখে আম্মা ক্ষেপে গিয়ে বলেন, তুমি এ কি করেছো ?

কাজের মহিলা বললেন, বিবিজী, ওরাও মাঝে মধ্যে আমাদের কাছ থেকে আটা ধার নেয় এবং ওদের ভাঙ্গানো আটা আসলে ফিরিয়ে দেয়। কাল আমাদের আটা যখন আসবে তখন এ আটা ফিরিয়ে দেব।

কিন্তু আম্মা অসন্তুষ্টির সাথে বললেন, "তাদের ব্যাপার আলাদা। তারা যতখুশী অন্যদের কাছ থেকে আটা ধার নিক। কিন্তু আমরা এমন করতেই পারি না। লোকে কি বলবে ? মাওলানা সাহেব জেলে গেছে আর তার ঘরের লোকেরা প্রতিবেশীর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে খাচ্ছে। ঘরে যখন আটা ছিল না আমরা যেভাবেই সম্ভব দিন কাটাতাম, খিচুরি রান্না করতাম। কিন্তু আটা ধার নেয়ার কাজটি তুমি মোটেও ঠিক করোনি। ভবিষ্যতে এ ধরনের কোনো কাজ করা হবে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।

আম্মা প্রায়ই বলতেন, "দুনিয়াতে বাঁচতে হলে অনেক কিছু ত্যাগ করা যায়; বরং ত্যাগ করেও বেঁচে থাকা যায়।" সে যাই হোক আমাদের জীবনের সেই কঠিনতর দিনগুলোও আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে কেটে গেল। ১৯ মাস ২৫ দিন কারা ভোগের পর আব্বা ১৯৫০ সালের ২৮ মে মুক্তি পেয়ে আমাদের মাঝে ফিরে আসলেন। আমরা আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠলাম। ফুলের মালা আর তোড়া নিয়ে আসলেন শত শত ভক্ত।

* * *

www.pathagar.com

## আবার কারান্তরালে : এবার সামরিক আইনে

১৯৫৩ সলের ২৮ মার্চ সরকার সামরিক আইনের অধীনে আব্বাকে আবার গ্রেফতার করে। পরিবারের অবস্থা আগের মতই, নিদারুণ অর্থকষ্ট। আমরা ছোট ছোট আটজন ভাই-বোন নিয়ে আম্মার সংসার। এবার আম্মার অসুস্থতা ও দুর্বলতা ছিলো আরো বেশী। তারপরও পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য তিনি সংগ্রাম শুরু করলেন। নিজের গয়না বিক্রি করেই চালাতে লাগলেন সংসার। ঘরের সমস্ত চাকর-বাকর বিদায় দিয়ে নিজেই রান্না থেকে শুরু করে সব কাজ করতে লাগলেন। এবার সামরিক আইনের অধীনে মার্শাল ল' কোর্টে আব্বার বিচার প্রক্রিয়া চলছিল। 'কাদিয়ানী সমস্যা' শীর্ষক একটি পুস্তিকা লেখার অপরাধে তখন আব্বাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। ৯ মে ১৯৫৩ সালে মামলার বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

১১ মে ১৯৫৩ সালের সকাল বেলা। আম্মা সকালের নাস্তা বানাচ্ছিলেন আর আমরা স্কুলের ইউনিফর্ম পরে নাস্তা খাবার অপেক্ষায় বসেছিলাম। সকলেরই ক্লাস সকালে শুরু হবে। এরই মধ্যে আমাদের বড় ভাই সাইয়েদ উমর ফারূক (জন্ম : ১৯৩৮, ১২ এপ্রিল, দিল্লী) অত্যন্ত চিন্তিত বিচলিত অবস্থায় একটি খবরের কাগজ হাতে করে বাসায় আসলেন আর আম্মাকে একটু পাশে নিয়ে কাগজের মধ্যে কি যেন দেখালেন। কি যে ছিল সে পত্রিকায়, দেখা মাত্রই আম্মার চেহারা বিবর্ণ পাণ্ডুর বর্ণ হয়ে গেল। পর মুহূর্তেই তিনি নিজেকে সামলে নিলেন, আবার নাস্তা তৈরীতে মনোনিবেশ করলেন, আর পত্রিকাটি লুকিয়ে রেখে দিলেন। দেখে মনে হলো তিনি ঠিক আগের মতোই আমাদের জন্য পরাটা বানাচ্ছেন, যেন কিছুই হয়নি। এরপর আমাদের নাস্তা করিয়ে স্কুলে পাঠালেন আর বড় ভাইকে (উমর ফারুক) স্কুলে যাবার জন্য তাগিদ দিলেন। ভেতর থেকে বড় ভাইয়ের সকরুণ কণ্ঠ শুনলাম, না আম্মা। আজ আমি স্কুলে যেতে পারবো না। স্কুলের পথে রওয়ানা হয়েই গলির মুখে পৌঁছে মেজ ভাই আহমদ ফারূক (জন্ম : ১১ মে ১৯৩৯, দিল্লী) শুনলেন একজন হকার পত্রিকা হাতে চিৎকার করছে, "মাওলানা মওদূদীর ফাঁসি হয়েছে।"

আমি আর ছোট বোন আসমা (জন্ম : ২৩ ডিসেম্বর ১৯৪১) যখন স্কুলে রওয়ানা হলাম তখনও পত্রিকার হকারদের মুখে একই কণ্ঠ ধ্বনিত হচ্ছে: "মাওলানা মওদূদীর ফাঁসির আদেশ হয়েছে!" এবার আমরা বুঝতে পারলাম উমর ভাই কেন পত্রিকা হাতে এতটা ভীত-বিহ্বল হয়ে বাসায়

www.pathagar.com

এসেছিলেন। আর পত্রিকা দেখে কেন আম্মার মুখখানি পাণ্ডর বর্ণ হয়ে গিয়েছিল এক মুহূর্তের জন্য। যাই হোক আমরা দুবোন বাসায় ফিরলাম না। সোজা স্কুলে চলে গেলাম।

আমরা ৬০নং ফিরোজপুর রোডে অবস্থিত সরকারী স্কুলে পড়তাম। আর প্রতিদিন পায়ে হেঁটেই স্কুলে যেতাম। সেদিনও গেলাম পথে পথে হকারদের চেঁচামেচি শুনতে শুনতে। আমাদের দু-জনকে স্কুলে দেখে সবাই দেখি হতবাক। অনেকেই বিশ্বাস করতে পারছে না আজকার দিনেও আমরা স্কুলে। আমাদের হেড মিসট্রেস ভদ্র মহিলা ছিলেন খৃস্টান। তিনি সকালে যখন এসেম্বলীতে আমাদের দেখলেন তখন ছাত্রীদের উদ্দেশে বক্তৃতায় বললেন, "দেখো তোমরা। নেতা এমনই হয়, পিতাকে প্রাণদণ্ড দেয়া হয়েছে আর কন্যারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ইউনিফরম পরে নিশ্চিন্তে দাঁড়িয়ে আছে স্কুল এসেম্বলীতে। ধন্যবাদ আর অভিনন্দনের সবটুকুই প্রাপ্য সেই 'মায়ের' যিনি আজকের এ বিপদসংকুল কঠিন দিনেও কন্যাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিয়ে, চুলের বেনী বেঁধে, নাস্তা করিয়ে স্কুলে পাঠিয়েছেন। এটা এই মেয়েদের কৃতিত্ব নয়, এ সাফল্যের দাবীদার তো ওদের মা। যিনি আজকার দিনটিতেও শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কোনো জাহেল মহিলা হলে কান্না জুড়ে দিয়ে মহল্লা এক করে ফেলতো।" হেড মিসট্রেস ম্যাডাম আরো বললেন, "সাধারণ মানুষ আর নেতাদের মধ্যে পার্থক্য এখানেই।" আমি তখন পড়ি ক্লাস নাইনে আর আসমা সেভেনে।

খৃস্টান হয়েও প্রধান শিক্ষিকা কতো সুন্দর দৃষ্টান্তমূলক কথা বললেন। অথচ আমাদের অন্যান্য মুসলিম শিক্ষিকারা বলাবলি করছিলেন : "ইনি আবার কোথাকার নেতা বনে গেলেন, পাকিস্তান সৃষ্টির বিরোধিতা করেছিলো। মেয়েদের দেখো, কত বড় অভিনেত্রী, সেজেগুজে এসেছে স্কুলে, এসব অভিনয় চালাক মায়ের চতুর কন্যারা।"

* * *

www.pathagar.com

# স্মরণীয় দি-বিভীষিকাময় রাত

স্কুল শেষে আমরা যখন ৫-এ যায়েলদার পার্কে অবস্থিত আমাদের বাসায় ফিরলাম তখন এখাকার চিত্র ছিল ভিন্ন। সমগ্র এলাকা লোকে লোকারণ্য। বাস আর মানুষের ভীড় ঠেলে হাঁটাই কঠিন। দূর দূরান্তের বিভিন্ন শহর থেকে যারা এসেছিল তারা বাস রিজার্ভ করে চলে আসে। আমরা দুবোন বড় কষ্টে ভীড় অতিক্রম করে বাড়ীর প্রধান ফটক পর্যন্ত পৌঁছলাম। কিন্তু এরপর ঘরে প্রবেশ আরও কঠিন মনে হলো। কিছু লোক বিলাপ করছিল, কেউ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন আর অন্যরা নীরবে অশ্রুপাত করছিলেন। এদের মধ্যে অনেক পরিচিত লোকেরা যখন আমাদের স্কুল ব্যাগ নিয়ে ঘরে ঢুকতে দেখলেন তখন তারা চোখের পানি মুছে পরস্পর বলতে লাগলেন : যখন মাওলানার বাচ্চারা কাঁদছে না, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে পারিস্থিতি মোকাবিলা করছেন তখন আমরা অধৈর্য হই কেন। অনেকে বললো : একেই তো বলে সবর।

অতিকষ্টে ভীড় অতিক্রম করে আমরা অন্দর মহলে প্রবেশ করে দেখি সমগ্র বাড়ী মহিলায় ভরপুর। মহিলারা সমবেদনা প্রকাশ করতে এসে কেঁদে কেঁদে হয়রান হয়ে যাচ্ছিলেন। আম্মা আর দাদীমাকে তারা সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন। আম্মা যখন আমাদের দেখলেন শুধু এতোটুকু বললেন, "বেটা ঘাবড়াবে না, সবর করবে।" এরপর নিজ হাতের রান্না করা খাবার আমাদের খাওয়ালেন তারপর আগত মহিলাদের মাঝে গিয়ে বসে পড়লেন।

আগত মহিলাদের মধ্যে একজন আম্মাকে ১০০ রাকআত সালাতুল হাজত আদায় করে তাহাজ্জুদ পড়ার পরামর্শ দিয়ে মানত করতে বললেন। তিনি আরও বললেন, মাওলানা সাহেব সহী সালামতে বাড়ী ফিরে আসলে আপনি আরও ১০০ রাকআত নফল নামায আদায় করে মানত পুরো করবেন। সে রাতে আম্মা আর ঘুমাননি। সারারাত নফল নামায আদায় করেছেন। আমি শুয়েছিলাম, সে রাতে আমিও ঘুমাতে পারিনি। যখনই তাকিয়েছি দেখেছি আম্মা জায়নামাযের উপর সিজদায় অবনত নফল নামায আদায় করেই চলেছেন।

মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে ধ্বনিত হলো ফজরের আযান। আমরা সবাই জেগে উঠলাম। যার যার মতো ফজরের নামায আদায় করলাম। ফজরের নামায পড়ে আম্মাজান কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করতে বসলেন। ফজরের পর

www.pathagar.com

কুরআন অধ্যয়ন ছিল আম্মার রুটিন ওয়ার্ক। ঐদিন আম্মা যে আয়াত থেকে পড়া শুরু করলেন তা নিম্নরূপ :

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ط مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَآءُ وَالضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُاللّٰهِ ط اَلَآ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ ۝

অর্থ : "তোমরা কি মনে করেছো তোমরা অতি সহজেই জান্নাতে যাবার অনুমতি পাবে ? অথচ এখন পর্যন্ত তোমাদের উপর তোমাদের পূর্ববর্তিদের মতো (বিপদ-আপদ) আবর্তিত হয়নি। তাদের উপর বহুকষ্ট কঠোরতা, বিপদ-মুসিবত আবর্তিত হয়েছে। তাদেরকে অত্যাচারে, নির্যাতনে জর্জরিত করে দেয়া হয়েছিল। এমনকি শেষ পর্যন্ত সে সময়ের রাসূল ও তাঁর সঙ্গী-সাথীগণ আর্তনাদ করে বলে উঠেছিলেন, আল্লাহর সাহায্য কবে আসবে ? তখন তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছিল, আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে।" (সূরা বাক্বারা : ২১৪)

এ আয়াত তিনি বার বার পড়ছিলেন আর ডুকরে কেঁদে উঠছিলেন। এরপর আমাকে ডেকে আয়াতখানির অর্থ দেখিয়ে বললেন ঃ "দেখো ! এ একটি জীবন্ত কিতাব। এ কিতাব, এ গ্রন্থ আবহমান মানবতার সুখ-দুঃখের কথা বলে। এ গ্রন্থ আত্মভোলাকে স্মরণ করিয়ে দেয় ভুলে যাওয়া সবক। এটা আহত মানুষের ক্ষতস্থানে মলমের মতো প্রলেপ এটে দেয়। তবে শর্ত একটি এ গ্রন্থের সাথে তোমার বন্ধুত্ব করে নিতে হবে তাহলে এ কিতাব তোমাকে পথনির্দেশ দিবে। তোমার বর্তমান অবস্থান, তোমার মনের অবস্থা মোতাবেক তোমাকে সান্ত্বনা দিবে পরামর্শ দিবে, পথপ্রদর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে। এখন একটু চিন্তা করে দেখ আমাদের বর্তমান পরিস্থিতি-আমাদের মনের অবস্থা মোতাবেক এ গ্রন্থটি কি সুন্দর আমাদের সান্ত্বনা দিচ্ছে, কিভাবে মলমের মতো ঔষধি প্রলেপ এটে দিচ্ছে আমাদের ক্ষতস্থানে।"

তখন আমার বয়স মাত্র তের। বড় মেয়ে হবার কারণে আমি ছিলাম আম্মার মনের খুব কাছের মানুষ। হয়তো বড় মেয়ে ছোট বোন বা বান্ধবীর মত হয়ে থাকে। এ জন্যই আম্মা প্রায়ই মনের অনেক কথা আমার কাছে খুলে বলতেন। আমার কাছে পরামর্শ নিতেন আর অনেক গোপন কথা আমানতস্বরূপ বলে দিতেন, কারণ তিনি আমার উপর যথেষ্ট আস্থাশীল ছিলেন। আজ আমি অনুভব করি আমার শৈশবের কৈশোরের

www.pathagar.com

সেই দিনগুলোতে আম্মা যে কথাগুলো আমাকে বলতেন তার অনেক কথাই ছিল এক ধরনের স্বগোতক্তি। সে কথাগুলো অন্য কারো কাছে বলার মতো নয়। তিনি প্রায়ই বলতেন দুর্ভাগ্য তাদের, যাদের কোনো কন্যা সন্তান নেই। এজন্যই তিনি তার তিন কন্যাকে এতো আহ্লাদ আর বাৎসল্যে লালন পালন, অতপর শিক্ষা সমাপন করিয়েছিলেন যা কিনা পুত্রদের ভাগ্যে জোটেনি। পরবর্তী সময়ে আব্বাও অনেক মনের কথা আমাকে আর আসমাকে বলতেন।

এরপর আম্মা সারাদিন ভালোভাবেই কাটালেন। উপরোল্লিখিত আয়াতখানি বার বার পড়তে থাকলেন। আমাদের বললেন, কুরআন মজিদ সম্পূর্ণটাই আল্লাহর নেয়ামত। এ নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা ওয়াজিব। কারণ আল্লাহ পাক আমাদের একটি জীবন্ত কিতাব দান করেছেন। তবে উল্লিখিত আয়াতটি আমাদের প্রতি বড় বেশী ইহ্সান করেছে। এ আয়াতটি এক অতি নাজুক পরিস্থিতিতে আমাদের সাহস যুগিয়েছে।

বিভীষিকাময় আরও একটি রাত পার করলাম আমরা। বাইরে পুরুষ আর অন্দরমহল সমবেদনা প্রকাশ করতে আসা মহিলায় ভরে উঠলো। সমবেদনা জানাতে আগত মা-বোনেরা আসতেন কাঁদতে কাঁদতে। ঘরে প্রবেশ করে আম্মা আর দাদীর অবস্থা দেখে তারা চুপ হয়ে যেতেন। নীরবে বহমান অশ্রুধারা মুছতে মুছতে বসে পড়তেন। তারা একে অপরকে পরস্পর বলাবলি করতেন. "একেই তো বলে সবর"।

আব্বাজানকে প্রদত্ত মৃত্যু দণ্ডের বিরুদ্ধে শুধু পাকিস্তানেই নয় সমগ্র মুসলিম বিশ্বে বিক্ষোভের দাবানল জ্বলে উঠে। তার প্রতি এহেন জঘন্য আচরণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে হরতাল, শোভাযাত্রা, সভা-সমিতি প্রভৃতি শুধু বড় বড় শহর ও রাজধানীতে সীমাবদ্ধ থাকলো না বরং দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল গ্রাম-গঞ্জ, হাট-বাজার আর মফস্বল শহরে বিক্ষোভের অগ্নিশিখা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। ইংল্যাণ্ডে শিক্ষারত মুসলিম দেশগুলোর ছাত্রবৃন্দ ও প্রবাসী মুসলমানরা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলীর (বগুড়া) নিকট প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে মৃত্যুদণ্ড প্রত্যাহার ও আশু মুক্তি কামনা করেন। টানা পাঁচমাস চলমান এ বিক্ষোভ কোনো সাময়িক উত্তেজনার বশে করা হয়নি।

১৯৫৩ সালের ১৩ মে বিকেল বেলার কথা। আম্মা মাত্র আসর পড়ে বসে আছেন জায়নামাযে। এমন সময় জামায়াতে ইসলামীর এক ভদ্রলোক এসে বললেন, বেগম সাহেবাকে একটু দরজার কাছে আসতে



www.pathagar.com

বলুন। একথা শুনে আমরা সবাই আঁৎকে উঠলাম, না জানি কি খবর! আম্মাও ত্রস্তপদে বিচলিত ভারাক্রান্ত চেহারা নিয়ে দরজার এপাশে দাঁড়িয়ে সালাম দিলেন। দরজার ওপাশ থেকে আগন্তুক বললেন, 'বেগম সাহেবা মোবারক হো'। মাওলানার প্রাণদণ্ড মওকুফ করে ১৪ বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। আর সরকারের বিরুদ্ধে একটি বিবৃতি প্রদানের জন্য আরও ৭ বছর কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। ভদ্রলোক তার কথা বলে যাচ্ছিলেন আর দরজার এ পাশে আম্মা প্রথম কয়েকটি শব্দ শোনামাত্রই দাঁড়ানো থেকে সরাসরি সিজদায় লুটিয়ে পড়েন। আমরা ভাই-বোনেরা আম্মার দেখাদেখি সিজদায় লুটিয়ে পড়ে মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলাম। মুহূর্তের মধ্যেই পরিস্থিতি পাল্টে গেল।

সকল মহল থেকে অভিনন্দন আর শুভেচ্ছা আসা শুরু হলো। কেউ এটা চিন্তাই করলো না যে, এখনও ২১ বছর কারাগারের জীবন বাকী আছে। আম্মা বার বার বলতে থাকলেন আল্লাহর ওয়াদা সত্য। 'আ'লা ইন্না নাসরুল্লাহিল ক্বারীব-এ আয়াতাংশ পড়ে বললেন, দেখ এ আয়াত আর হাদীসসমূহ যেন নিজেরাই নিজেদের তাফসীর পেশ করে বলছে, যে, এমন পরিস্থিতির জন্যই আমরা আর এই হলো আমাদের অর্থ।'

এদিন আম্মা আমাদের একটি স্বপ্নের কথা বললেন। আব্বাকে প্রাণদণ্ড দেয়ার মাত্র একদিন পূর্বে তিনি স্বপ্নে দেখেন, (আম্মার বর্ণনায়) : "আমি দেখলাম এখানে একটি উড়োজাহাজ এসে অবতরণ করলো। তারপর তোমাদের আব্বাজান আমাদের সবাইকে নিয়ে সেটিতে আরোহণ করলেন। উড়োজাহাজটি রকেটের মতো সোজা উপরের দিকে উড়াল দিল। আমার মাথা ধরে গেল, আমি ঘাবড়ে গেলাম, কোথায় যাচ্ছি আমরা, চিন্তা করে। বিমানটি একটি স্থানে গিয়ে থামলো। এরপর তোমাদের আব্বাজান আমার হাত ধরে জাহাজ থেকে নামালেন। আমার জান যায় যায় অবস্থা আর তোমাদের আব্বাজান আমার হাত শক্ত করে ধরে বলছেন, 'একটু নীচের দিকে তাকাও তো দেখি তুমি কত উপরে উঠেছো বুঝতে পারবে' নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি মানুষগুলো পিঁপড়ার মতো আর বিল্ডিংগুলো মনে হচ্ছে খেলনা। এ দৃশ্য দেখতে দেখতেই আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল।"

স্বপ্নের বর্ণনা শেষ করে আম্মা বললেন, আজ এ স্বপ্নের তাবীর বুঝে আসছে। মনে হচ্ছে হযরত ইবরাহীম আ.-এর হাতে হযরত ইসমাঈল আ.-কে যবেহ করানো যেমন আল্লাহর উদ্দেশ্য ছিল না, বরং পিতাকে খলিলুল্লাহ আর পুত্রকে জাবিউল্লাহর মর্যাদায় আসীন করাই ছিল বারী এ

www.pathagar.com

তা'আলার লক্ষ্য। তেমনি আমাদের মতো গুনাহগার মানুষদের বড় বড় পরীক্ষার ভেতর দিয়ে উত্তীর্ণ করিয়ে মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন আল্লাহ।

আরও একটি স্বপ্নের কথা প্রকাশিত হয়েছিল লাহোর থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক আফ্রো-এশিয়া'তে চিঠিপত্রের কলামে। চিঠি পত্রের কলামে সারগোদা জেলার মিয়া রহীম বক্শ বর্ণনা করেন, "আমি স্বপ্নে হুজুর সা.-কে দেখলাম, তিনি দোয়া করছেন, ইয়া আল্লাহ! রহম করো, মওদূদী আমার দীনের কাজ করছে, তুমি একে এখন জীবিত রাখ। সে তোমার দীনের কাজ করছে। হে আল্লাহ! রহম করো।" এরপর মিয়া রহীম বক্শ বর্ণনা করেন, "এ অবস্থায় আকস্মিক অদৃশ্য থেকে আওয়াজ এলো, হে মুহাম্মদ সা.! আমরা তোমার দোয়া কবুল করে নিয়েছি।" এ আওয়াজ আসাতেই আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। সময় ছিল তখন ভোরবেলা। মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে ভেসে এলো আযানের সুমধুর ধ্বনি। আমি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। আমার দুগণ্ড বেয়ে নেমে এলো অশ্রুধারা।

এ স্বপ্নের তা'বীর বুঝতে পারলাম তখন যখন মাওলানা মওদূদীর মৃত্যুদণ্ড মওকুফ হলো।

আম্মাকে একবার এক ভদ্রমহিলা বলেছিলেন, "আপনার দারসে কুরআন ও দারসে হাদীসে যে মজা পাই তা অন্য কারও দারসে অনুভব করি না। এর কারণ বলবেন কি ?"

এ প্রশ্নের জবাবে আম্মা বলেছিলেন, "দারসের আয়াত আর হাদীসসমূহের অর্থ আমরা যেভাবে বুঝেছি অন্যরা তা তখন বুঝতে পারবে যখন তারা এমন অবস্থার মধ্যে নিপতিত হবে, যে অবস্থার আজ আমরা মোকাবিলা করছি।"

দাদী আর আম্মাজান সবসময় চেষ্টা করতেন বাচ্চাদের হাসি-খুশী ও আনন্দে রাখতে। সন্তানদের মানসিকতার উপর যেন কোনো ধরনের খারাপ প্রভাব না পড়ে সেদিকে তাদের সজাগ দৃষ্টি থাকতো। আম্মা বলতেন, মানুষের শৈশব হাসি-খুশী আর আনন্দে ভরপুর হওয়া উচিত। শৈশবে একজন শিশুর কোনো অবস্থাতেই নিরাপত্তাহীনতার শিকার হওয়া উচিত নয়। কারণ শিশুকালে কোনো কিছু না পাবার বেদনা দুঃখ তার ব্যক্তিত্ব গঠনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। আর এ স্মৃতি জীবনভর একজন মানুষকে তাড়া করে ফিরে। প্রত্যেক শিশুর এ অনুভূতি হওয়া উচিত যে, আপন গৃহে যে একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব, বরং সে যেন মনে করতে পারে সে আপন গৃহে একজন ভি ভি আই পি। তাহলে শিশুর মধ্যে জীবনের শুরু

www.pathagar.com

থেকেই প্রবল আত্মবিশ্বাস জন্ম নিবে। আম্মা মাঝে মধ্যেই দুশ্চিন্তা করতেন, 'হায় হায় আমার ছেলেমেয়েরা শিশু বয়সেই বুড়ো হয়ে গেল, ওদের শৈশব যেন ছিনতাই হয়ে গেল। এ দুশ্চিন্তা দূরীকরনের জন্য তিনি আমাদের নানা ধরনের যত্ন করতেন আর বিভিন্ন ধরনের আনন্দদায়ক কাজে নিয়োজিত করে আমাদের ব্যস্ত রাখতেন।

একদিন মুলতান জেল থেকে আব্বার বার্তা এলো সকলের প্রতি যে, ছেলেমেয়েরা সকলেই যেন আব্বাকে আলাদা আলাদা চিঠি দেয়। যাই হোক আব্বার বার্তা পেয়ে আমরা সবাই চিঠি লিখতে বসে গেলাম। একদিন এই চিঠি মুলতান জেলে পাঠিয়ে দেয়া হলো। আমাদের চিঠির জবাবে আব্বা সবাইকে আলাদা আলাদা চিঠি দিলেন এবং চিঠির সাথে সবার জন্য একটি করে ছোট সাইজের কাপড়ের থলে উপহার হিসেবে পাঠালেন। আব্বার একটি পুরানো নীল রঙ্গের পাঞ্জাবী কেটে নিজের হাতে সুই-সুতা দিয়ে আব্বা ছোট ছোট থলেগুলো তৈরী করেছিলেন। এই থলেগুলোতে খোসা ছাড়ানো চিলগোযা, বাদাম, পেস্তা আর আখরোট, কিসমিস ভরা ছিল। এরপর প্রত্যেক থলের গায়ে চিরকুটে আমাদের সবার নাম লিখে তা আবার আটার তৈরী লেই দিয়ে সাটানো ছিল। কোনটিতে 'নয়নমণি' কোনোটিতে 'বাছাধন' আবার কোনোটিতে 'হৃদয়ের পুটুলি' লিখে অতঃপর পুত্র বা কন্যার নাম লেখা ছিল।

এই পত্র ও থলেসমূহে যে কি ছিল। তা দেখামাত্রই দাদী ডুকরে কেঁদে উঠলেন, তার দুগণ্ড বেয়ে নেমে আসলো অশ্রুর বন্যা। পর্বত প্রমাণ ধৈর্যশীলা এ নারীর অশ্রু সেদিন পুত্রের প্রেমে আর বাঁধ মানেনি। আমাদের সামনেই তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকলেন। আর আম্মাজান! তার চেহারা আব্বার শোকে দুঃখে বিবর্ণ থমথমে হয়ে গেল, পুরোটা দিন তিনি নীরবই থাকলেন, তেমন একটা কথা বললেন না আমাদের সাথে। কারাগার থেকে আসা এ জীবন্ত থলেগুলো যেন কথা বলছিলো। থলেগুলো কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে কালের সাক্ষ্য দিচ্ছিল। কারাজীবনের অসহায়ত্ব, একাকীত্ব, সন্তানদের কাছ থেকে দূরত্ব, আপনজনদের সাথে মিলনের অভাব আরও কতো অভাব অভিযোগের ডালি মেলে ধরেছিলো থলেগুলো দাদী আর আম্মার সামনে জানি না। একথা সত্য যে, আব্বা ধৈর্য-সাহস ও বলিষ্ঠতায় ছিলেন পর্বতের ন্যায় অনড়-অটল, কিন্তু বাদাম-পেস্তা ঠাসা থলেগুলোর উপর 'নয়নমণি', 'বাছাধন', 'হৃদয়ের পুটুলি' লেখা চিরকুট দেখে মনে হচ্ছিল এ অটল পর্বতের ভিতরেও একজন স্নেহপরায়ণ পিতা, প্রেমময় স্বামী আর মাতৃভক্ত পুত্রের অনুভূতিপূর্ণ অন্তরও ছিল। যে অন্তর মানুষের অন্তর, মানুষেরই মন।

www.pathagar.com

আমরা ভাইবোনরা তো দারুন খুশী হয়েছিলাম সেদিন। বাবার পাঠানো উপহার তা আবার খাবার বস্তু। আমাদের শিশু মন তাড়াহুড়ো করে ড্রাই ফ্রুটগুলো খেতে মত্ত হয়ে পড়লো। চিন্তাহীন শৈশবে আমরা অনুভবও করতে পারিনি সেদিন আব্বা কত দরদ আর ভালবাসা দিয়ে চিলগোযা—বাদাম-পেস্তার খোসা ছাড়িয়েছিলেন, এরপর অন্তর উজাড় করা কতো ভাবাবেগ দিয়ে নিজের পরনের কাপড় কেটে তৈরী করেছিলেন নয় নয়টি থলে। অতঃপর এই স্নেহপরায়ণ পিতা কত আদর আর বাৎসল্য ভরে আমাদের নয় জনের নাম লিখে সেটে দিয়েছিলেন থলের উপর চিরকুট। আমাদের দায়িত্ব আমরা পালন করলাম, খাবার জিনিস খেয়ে নিলাম। দাদী আর আম্মা কিন্তু থলেগুলো সযত্নে সংরক্ষণ করলেন। আজ মনে হয়, হায়! সেই কাপড়ের থলেটি যদি আমার সংগ্রহে থাকতো, যাতে আব্বা আমার নাম লিখেছিলেন। সেই থলেটি আজ এক মহামূল্যবান স্মারক হতে পারতো।

আম্মা একবার দাদীকে অনুরোধ করে বলেছিলেন, আপনি কাউকে বদ দোয়া করবেন না। কারণ আপনার বদদোয়া বা দোয়া উভয়ই অক্ষরে অক্ষরে ফলে যায়। ১৯৫৩ সালে আব্বা যখন কারাগারে তখন দাদী একবার বলেছিলেন, "যে আমার ছেলেকে জেলে ভরে পঁচাচ্ছে, হে আল্লাহ! তুমি তাকে খাটে ফেলে এমনভাবে পঁচাও যাতে তার অর্ধাংগ গলে যায়।" এর কয়েক মাস পরেই পত্রিকায় আমরা দেখলাম পাকিস্তানের গবর্নর জেনারেল মালিক গোলাম মোহাম্মদ প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী।

কষ্টের পর আবার এলো খুশীর দিন। ২৫ মাস কারাবাসের পর ১৯৫৫ সালের ২৯ এপ্রিল আব্বা নিঃশর্ত মুক্তি লাভ করে আমাদের মাঝে ফিরে আসলেন। আহ্! সেদিনটি ছিল দারুণ মজার একটি দিন। ফুলে ফুলে ভরে উঠলো আমাদের গৃহকোণ। ভক্তদের আনা মিষ্টিতে ভরে উঠলো চারদিক। বহুদিন পর এ আনন্দঘন দিনটি কাটিয়ে আমরা ঘুমাতে চলে গেলাম।

আনন্দের আতিশয্যে আর ক্লান্তির কারণে আমরা এশার নামায পড়তে ভুলে যাই। এশা না পড়েই ঘুমাতে যাই। মুহূর্তেই শুনলাম আম্মার রাগত: কণ্ঠস্বর "একটু চেয়ে দেখ এ বেশরম অকৃতজ্ঞদের। যেখানে শুকরানার নফল পড়া উচিত সেখানে এরা ফরয নামাযই বেমালুম ভুলে গেছে। যখন বাপের ফাঁসীর আদেশ হয়েছিলো তখন তো নফলের পর নফল পড়ে দোয়া করেছো। এখন মতলব হাসিল হয়ে গেছে, বাবা ফিরে এসেছে ঘরে। আবার কি কখনো দোয়া নামাজের প্রয়োজন হবে! আম্মার এ সতর্কবাণী শোনামাত্রই আমরা সাথে সাথে ওজু করে এশার নামায পড়ে তারপর ঘুমোতে যাই।

www.pathagar.com

আব্বার মুক্তির দিন দিবাগত রাতে আম্মা সারারাত নফল আদায় করে কাটিয়ে দেন। এটা ছিল তার মানত। আব্বার প্রাণদণ্ডাদেশ শোনার দিন দিবাগত রাতে আম্মা ১০০ রাকআত নফল নামায পড়ে মানত করেছিলেন যে, স্বামী যখন সহীহ সালামতে বাড়ী ফিরে আসবে তখন ১০০ রাকআত শুকরানার নফল নামায আদায় করবেন।

এবার নফল আদায়ের সময় চায়ের ফ্লাস্ক ছিল তার কাছে। আর সামান্য বিরতিতে তিনি চা পান করছিলেন। অথচ ফাঁসীর আদেশ শোনার সেই বিভীষিকাময় রজনীতে আম্মা চা পান করেননি।

পরদিন ভোরে আম্মা বললেন, চিন্তা করে দেখ তো মানুষ কত বড় অকৃতজ্ঞ! যখন স্বামীর জীবন সংকটাপন্ন হয়ে পড়েছিল তখন ১০০ রাকআত নামায খুব কম মনে হয়েছিল। সেদিন ঘুম পায়নি, ক্লান্তিবোধ হয়নি, শরীরও খারাপ লাগেনি সর্বোপরি মনোযোগ নষ্ট হয়নি। যা মুখে বলেছি তা হৃদয় থেকেই আসছিল। দেহ ঝুঁকে পড়ার আগে মন ঝুঁকে পড়তো। কিন্তু কাল রাতে কখনো কখনো ক্লান্তি আবার, কখনো মাথাব্যথা —সেদিন সে রাতের মতো একাগ্রতা আসেনি। আম্মা এ দুর্বলতার কথা বলছিলেন আর সাথে সাথে তাওবা ও ইসতেগফার করে যাচ্ছিলেন, আরও বললেন, "সত্যি আমরা প্রকৃত অর্থে আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করতে সক্ষম নই। আমরা জীবনভর সিজদায় পড়ে থাকলেও আল্লাহ পাকের শোকর আদায় হবে না।

একবার আম্মা সন্তানদের দুষ্টামিতে বিরক্ত হয়ে আব্বাকে বললেন, কোনো বাবা তার সন্তানদের এতবেশী স্নেহ আহ্লাদ করে না। যেমন আপনি করেন। কখনো তো এদের শাসন করেন না, রাগ-ধমক দিয়ে কখনো শাসন না করলে কেমনে হবে। আম্মার কথাগুলোর জবাবে আব্বা খুব চিন্তা-ভাবনা করে বললেন, তুমি কি বুঝবে আমার কথা ? যখন আমি জেলে থাকি তখন ওদের জন্য আমার কেমন লাগে। ওদের চাহনি দেখার জন্য, ওদের ডাক শোনার জন্য, ওদের স্পর্শ পাবার জন্য আমার হৃদয় ভেতর থেকে মোচড় দিয়ে উঠে। ১৯৫৩ সালে যখন জেলে গেলাম তখন আমার ছোট ছেলে খালেদ ফারুক (জন্ম :১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৫২ লাহোর) মাত্র কথা বলতে শিখছিলো। তখনও ওর মুখ ফোটেনি। কারাগারের নিভৃত কক্ষে ওর তোতলা কথাগুলো আমার কানে ঝংকার তুলতো। এই নিস্তব্ধ শব্দমালায় আমি অনুভব করতাম আমি এক অতি মূল্যবান সম্পদ হারালাম। কারণ যখনই আমি জেল থেকে মুক্তি পাই না কেন, খালেদ

www.pathagar.com

বড় হয়ে যাবে, সে তার তোতলামির স্টেজ পার করে ফেলবে। যখন ওর সাথে দেখা হবে তখন সে কথা বলতে শিখে যাবে। আমি জেলে বসে আমার হৃদয়ের পটে ওদের ছবি একে কল্পনায় ওদের সাথে কথা বলতাম। কল্পরাজ্যে ওদের সাথে কথা বলেছি। আর আজ তুমি বলছো আমার সন্তানদের আমি কিনা হুমকি ধমকি দিব, রাগ করবো, শাসন করবো। এ আমার দ্বারা হবে না।

এরপর আব্বা আরও বললেন, "আল্লাহর কাছে না চাইতেই এতগুলো সন্তান পেয়ে গেছো। এজন্যই বলছো, এরা সবাই আমাকে বিরক্ত করে। যারা সন্তান পায় না, তাদের কথা কি তুমি জান ? সন্তান লাভের জন্য তারা কত আস্তানায় ধর্ণা দেয়, কত প্রকার শিরক করে আর কেমন কেমন জায়গায় গিয়ে নিজের ঈমান পর্যন্ত খুইয়ে দেয়।"

আব্বা যখন এগুলো বলছিলেন তখন আমরা কান পেতে শুনছিলাম আব্বা-আম্মার সংলাপ। এসব শুনে আর আমাদের দেখে আম্মা আরও রেগে বললেন : "আপনার এ সমস্ত কথার জন্যই ওরা বেশী মাথায় উঠেছে।"

* * *

www.pathagar.com

## কারাগারের সাতকাহন

আমরা আব্বার কাছে জেলের কাহিনী শুনতে চাইতাম। আমাদের আবদারে আব্বা একদিন কারাগারের গল্প বলতে শুরু করলেন। আব্বার বলা গল্প তারই ভাষায় বলার চেষ্টা করবো এখানে—

"আমাকে যখন লাহোর থেকে মুলতান জেলে নিয়ে যাওয়া হলো, তখন ছিল দুপুরবেলা। আমাকে যে কামরাতে রাখা হলো তাতে কোনো সিলিং ফ্যান ছিল না। গোসলখানায় পানির জন্য ছিল একটি চাপকল। প্রথম শ্রেণীর কয়েদীর জন্য নির্ধারিত ছিল এ কামরাটি। আমার দেখাশোনা ও সেবাযত্নের জন্য সি-ক্লাসের একজন কয়েদীকে নিয়োগ দেয়া হয়। সে বসে বসে আমার অপেক্ষা করছিল। প্রথমে সে খুব মনোযোগ সহকারে আমাকে দেখতে লাগলো। তারপর কাছে আসার পর সে আচমকা উঠে দাঁড়ালো। আমার আনা মালপত্র ব্যাগ সযত্নে হাতে নিয়ে কামরার ভিতর রেখে দিল। তারপর চাপকল চেপে আমার জন্য গোসলের পানির ব্যবস্থা করে দিল। এরপর বললো, মিয়াজী গোসলের কাজটা সেরে আসুন। গোসল সেরে এসে দেখলাম সে পুরো কামরায় বালি বিছিয়ে রেখেছে। এরপর পুরো ঘরে পানি ছিটিয়ে তার উপর খাটে সুন্দর করে বিছানা বিছিয়ে দিয়েছে। আমি বললাম, এ কামরাতে আমি প্রথমে তো বালি দেখিনি, এটা কেন বিছিয়েছো। জবাবে সে বললো, প্রচণ্ড গরম, তাই। আমি এর উপর পানি ছিটাতে থাকবো যাতে কক্ষটি ঠাণ্ডা থাকে আর আপনি দুপুরে আরাম করতে পারেন।

"এরপর আমি যোহরের নামায আদায় করলাম। আমার নামায পড়তে যতক্ষণ লাগলো ততক্ষণেই সে আমার খাবার তৈরী করে এনে পরিবেশন করলো। খাদ্য পরিবেশনের পর সে অত্যন্ত আদবের সাথে বলতে লাগলো, আপনার শখ আর পছন্দ অপছন্দের ব্যাপারে তো আমার কিছু জানা নেই। তাই তাড়াহুড়োর মধ্যে যা পেরেছি করে এনেছি।"

এরপর সে একটি বিষয় দারুনভাবে খেয়াল করে নিয়েছিলো যে, আমি কোন্ ঔষধ কখন খাই। তারপর থেকে প্রতিবেলায় সে খাবার সময় আমার নির্ধারিত ঔষধ বের করে সেবন করিয়ে দিত। যতদিন মুলতান জেলে ছিলাম কোনদিন ওকে এটা বলার প্রয়োজন হয়নি যে, তুমি অমুক বেলা ঔষধ দাওনি বা দিতে ভুলে গেছো। আব্বাজান বিশেষভাবে বলেন, "সে কয়েদখানায় যেভাবে আমার খেদমত করেছে এবং মহব্বতের সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল তা দেখে আমি প্রায়ই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতাম।"

www.pathagar.com

একদিন সে আমাকে বলতে লাগলো, যখন সে আমার (আব্বাজানের) ডিউটি করার নির্দেশ পেল তখন জেল কর্তৃপক্ষ তাকে বলে দেয় একজন অত্যন্ত ভয়ানক কয়েদী আসছে যে সরকারকে দারুণভাবে বিচলিত করে রেখেছে। এ খতরনাক কয়েদীকে সোজা করে দিতে হবে। একে এতো বিরক্ত করবে, এমনভাবে জ্বালা-যন্ত্রণা দিবে যাতে ক্ষমার মুচলেকাতে সই দিতে বাধ্য হয়। আর সরকার যে শর্তে চায় সেই শর্তেই যেন রাজী হয়ে যায়। ব্যস, তাহলে তোমার কাজ শেষ। তোমার কাজই হলো তাকে বিরক্ত করা। তার জন্য এমন স্বাদহীন খানা রান্না করবে যেন খাওয়া না যায়। তাই আমি কারাগারের প্রথম শ্রেণীর কোয়ার্টারে বসে আপনার অপেক্ষার সাথে সাথে চিন্তা করছিলাম, না জানি আজ কার সাথে পাল্লা দিতে হবে। আমি নিজেও একজন অপরাধী, কারও চেয়ে কম নই আর অপরাধী আসামী দেখলেই চেনা যায়। যখন আপনি ভিতরে আসলেন তখন চিন্তায় চিন্তায় আমি হতবাক হয়ে যাই, এই ভেবে যে, এমন লোকের দ্বারাও কারো বিপদ হতে পারে ? মিয়াজী! কি আর বলবো, আপনাকে দেখামাত্র আপনার প্রতি মহব্বত আমার মনের মাঝে স্থান করে নেয়। মনের অজান্তেই আপনাকে ভালোবেসে ফেলি।

এরই মধ্যে একদিন জেল সুপার আসলেন দেখা করতে। কোনো অভাব অভিযোগ বা কষ্টের কথা বলতে বললেন। আমি বললাম, "কোনো অভিযোগ নেই। আমি খুব আরামে আছি।" এরপর প্রতিদিন জেল সুপার আসতেন, আর প্রশ্ন একটাই কোনো সমস্যা হচ্ছে কি ? শেষ পর্যন্ত জেলের সুপার বলেই বসলেন, আপনি কষ্ট সহ্য করেও বলছেন ভালো আছেন। নতুবা আপনি সঠিক তথ্য গোপন করছেন। "আমি বললাম, কষ্ট হলে পরে না হয় বলবো। আমার কোনো সমস্যা হলে আপনাকে জানাতে কুণ্ঠিত হবো না।"

আমার কথা শুনে জেল সুপার বললেন, "অমুক অমুক নেতা ও রাজ নীতিবিদ এ কুঠরীতে তিনদিনের বেশী থাকতে পারেননি। মুচলেকা দিয়ে ক্ষমা চেয়ে চলে গেছেন। এ মুচলেকা সরকারের ফাইলে রয়েছে। যখনই সেই নেতা বা রাজনীতিক সরকার বিরোধী একটু বাড়াবাড়িমূলক বক্তব্য দিবেন, সাথে সাথে তাকে ফোনে জানানো হবে আমরা (সরকার) কিন্তু আপনার সই করা ক্ষমা চাওয়া মুচলেকা আগামীকালের সংবাদপত্রে ছাপিয়ে দিব। এ ফোন পেয়েই তারা আবার মুষড়ে যাবেন। একজন রাজ নীতিবিদ মাত্র দু'দিনে কান্নাকাটি করে ক্ষমা চেয়ে এখান থেকে চলে গেছেন। আপনি কি ধরনের মানুষ যে, এখানে বেশ হাসিখুশী বসে আছেন আর বলছেন, আমি খুব আরামে আছি।

www.pathagar.com

জেল সুপারের কথা শুনে আমি তাকে বুঝালাম এই বলে, 'ভাই। জীবন যখন একটি বিশেষ উদ্দেশ্য হাসিল করবার জন্য ব্যয় করা হয় তখন শীত, গ্রীষ্ম, জেলের কুঠরী আর বেঁচে থাকার জন্য বাঁচা গুরুত্বহীন হয়ে যায়। আমি খুব চিন্তা ভাবনা আর বাছবিচার করেই এ পথে চলছি। ব্যক্তিগত আরাম ও যন্ত্রণা থেকে আমি সম্পূর্ণ বেনিয়ায হয়ে গেছি।

সুপারিন্টেনডেন্ট সাহেব এরপর বললেন, আচ্ছা বলুন তো আপনি আপনার আটজন সন্তানকে কি জন্য শাস্তি দিচ্ছেন। এদের ব্যাপারেও একটু ভেবে দেখুন।

আমি জবাবে বললাম, নিজ সন্তানদের আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট সোপর্দ করে এসেছি। এখন এ বিষয় তিনি জানেন। আর সন্তানরা জানুক, আমি তাদের ব্যাপারে মোটেও চিন্তিত নই।

*"কারসাজ মা বেফিক্‌র কার মা*
*ফিকর মা দার কার মা আযার মা"*

অর্থা: "মহাশক্তিধর দিনরাত আমার কাজেই ব্যস্ত।
আমার ফিকির আমি করলে প্রাণ হয় ওষ্ঠাগত।"

আব্বা খুব দারুণ করে বলে যাচ্ছিলেন কারাগারের সব গল্প আর কাহিনী। আম্মা আমাদের পাশে বসে আমাদেরই সাথে এসব শুনছিলেন।

* * *

www.pathagar.com

এরপর আব্বা আরও বলেন, আমি যখন তাফহীমুল কুরআন লিখতাম বা নামায পড়তে দাঁড়াতাম তখন অনুভব করতাম কে যেন চুপিসারে আমার কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করছে। পরে জানতে পারি আমার দেখাশোনার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিটিই টিকটিকির দায়িত্ব পালন করতো। এরই মধ্যে চলে এলো কুরবানীর ঈদ। জেল কর্তৃপক্ষ থেকে পাওয়া রেশন শেষ হয়ে এলো আর এরই মধ্যে ঈদের ছুটি শুরু হওয়ায় রেশন আসার প্রক্রিয়া বন্ধ ছিল। যাই হোক, ঈদের দিন সকালে রান্না করে খাবার মতো কিছুই রইলো না। আমার সে কয়েদী দারুণভাবে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লো। সে বলতে লাগলো এখনও রেশন আসেনি আপনাকে নাস্তা কেমনে দেই ? এসব কথা বলতে বলতে সে জেল কর্তৃপক্ষকে দু-একটি গালিও দিয়ে ফেললো।

আমি ওকে বললাম: রাতে যে বুটের ডাল আর আটার রুটি বেচে গিয়েছিলো সেগুলোই গরম করে নিয়ে আসো। সে বললো, ওগুলো আমি আপনাকে কখনই দিব না। ঈদের দিনেও কি কেউ গতরাতের বাসী রুটি খেতে পারে ? অসম্ভব !

আমি ওকে বুঝালাম : "ভাই, তুমি আমার জন্য চিন্তা করো না। আমি খুব খুশী হয়েই ডাল-রুটি খেয়ে নিব।"

এখানে উল্লেখ্য, সকাল আট্টার সময় নাস্তা করা আব্বার অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল বিধায় বাসী ডাল-রুটি খেতে আব্বার কষ্ট হয়নি। আর দাদীর প্রশিক্ষণ কাজে লেগেছিল সেদিন। যেমন তিনি বলতেন, আমার সন্তানদের একবেলা পোলাও কোরমা খাওয়ালে পরের বেলা রুটি-চাটনী খাবার অভ্যাস করিয়েছি। আব্বা আরও বললেন, ঈদের দিন যখন আমি নাস্তা করছিলাম তখন পেছন থেকে একজনের ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ পেলাম, চেয়ে দেখি সেই কয়েদী কাঁদছে। ওকে জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে ? বাচ্চাদের কথা, বাড়ীর কথা মনে পড়ছে ? সে বললো, 'আপনাকে ডাল-রুটি খেতে দেখে কাঁদছি। আমি চিন্তা করছিলাম যে, ঈদের দিন আমাদের ন্যায় হত-দরিদ্র লোকেরাও গত রাতের বাসী খাবার কোনোদিন খায়নি বোধ হয়। আর আপনি তো কত বড় মানুষ, আপনি কি কোনো দিন এমন খেয়েছেন ? বলুন.....।

তখন আব্বা ওকে স্নেহভরে বুঝিয়ে বলেন, দেখ ভাই; এ পথ আমি অনেক চিন্তা-ভাবনা করেই গ্রহণ করেছি। আর আমি মহানন্দে এ পথ

www.pathagar.com

পাড়ি দিচ্ছি। যদি কোনোদিন অভুক্ত থাকতে হয় তাহলেও অসুবিধা হবে না। আরামে থাকবো। তুমি ভাই আমার জন্য দুঃখ করো না। নাস্তা করে নাও।"

এর পরের ঘটনা, আব্বা বললেন, আমি তো নাস্তা সেরে তাফহীমুল কুরআন লিখতে শুরু করেছি, কিন্তু বেচারা প্রতিবাদস্বরূপ নাস্তাই করলো না। যদিও তার জন্য রুটি ডাল ছিল। এরই মধ্যে জেলখানায় আমাদের প্রথম শ্রেণীর কোর্য়াটারের দরজায় কে যেন আঘাত করলো। সে কয়েদী সাথী দরজা খুলে দেখলো সামনে দুজন সেন্ট্রী দাঁড়ানো। তাদের দু'জনের হাত বোঝাই নাস্তা, হাড়ি-পাতিল, টিফিন ক্যারিয়ার আর প্যাকেট ধরে দাঁড়িয়ে ওরা বললো, 'মাওলানা সাহেব! আপনার ভক্তরা ফজরের পরপরই নাস্তা এনে জেলের গেটে দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু জেল সুপারের অফিস খুলেছে ঈদের নামাযের পরে। অতঃপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও তল্লাশী করে খানা ভিতরে ঢোকানো হয়েছে। এজন্যই দেরী হয়েছে।' সে নাস্তাগুলো নিয়ে সবকিছু খুলে দেখলো, তাতে নানা ধরনের নাস্তা ও মিষ্টি ছিল। আমি ওকে বললাম, দেখো, এসব নাস্তা, মিষ্টি সব তোমার জন্যই এসেছে। কারণ তুমি মন খারাপ করে ক্ষুধার্ত বসে বসে কাঁদছিলে। এখন পেট ভরে খাও আর বাকী জিনিসগুলো অন্যান্য কয়েদীদের মধ্যে বিতরণ করে দাও। পরাটা, শামী কাবাব, হালুয়া, পুরি, শের-খোরমা ও মিষ্টি কার কাছে আজ ভালো না লাগবে বলো, সবারই এসব খেতে আজ মন চাবে। আমি এসব বলছিলাম আর আমার কয়েদী সাথী দুঃখ ভরা মনে আফসোস করে বলছিল, হায় ! হায়! কতই না ভালো হতো যদি সেই বাসী ডাল-রুটি আপনাকে না দিয়ে আমি কাক-পক্ষীকে দিয়ে দিতাম। আমার অনেক অনুরোধের পর সে নাস্তা করলো। তারপর বাকী নাস্তা অন্য কয়েদীদের মাঝে বিতরণ করে আসলো। কয়েদীদের মাঝে নাস্তা বিতরণের সময় সে প্রচার করলো, আমার মিয়াজীর জন্য এসব নাস্তা এসেছে। আর তিনি তোমাদের মাঝে বণ্টন করতে বলেছেন।

ঈদের দিন দুপুরবেলা আবার সেন্ট্রী এসে কড়া নাড়লো। ঠিক সকালের মতই কাপড়ে বাঁধা হাড়িতে করে দুপুরের খাবার চলে আসলো। এতো মজাদার ও এতো রকমের খানা এসেছিল যে, সেই কয়েদী অবাক হয়ে গেল। সে আমার জন্য খাবার সাজিয়ে দিল এবং বাকী কয়েদীদের মাঝে বিতরণ করে আসলো। রাতের বেলা ঠিক একই ঘটনা ঘটলো। যাহোক ঈদের তিনটি দিন আমাদের আন্দোলনের ভাইবোনেরা মুলতান কারাগারে নানা ধরনের এতো বেশী পরিমাণে আল্লাহর দেয়া নেয়ামতসমূহ পাঠালেন যে, পুরো জেলখানায় সাড়া পড়ে গেল।

www.pathagar.com

এদিকে আব্বাজান বলে যাচ্ছিলেন জেলখানার গল্প আর অন্যদিকে আম্মাজান বলছিলেন, দেখো সূরা মারিয়ামে একথাই বলা হয়েছে—

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا

অর্থাৎ "যেসব লোক ঈমান এনেছে এবং নেক আমলের পথ অবলম্বন করেছে, অতি শীঘ্রই আল্লাহ মানুষের মনে তাদের জন্য ভালোবাসা সঞ্চার করে দেবেন।" (সূরা মারইয়াম : ৯৬)

আম্মাজানের শিক্ষাদানের পদ্ধতি এমনই ছিল। তিনি কুরআনের আয়াত ও হাদীসসমূহকে শিক্ষা দানের জন্য জীবনের কাহিনীর সাথে সেগুলোর মিল তুলে ধরতেন। আজও আম্মার সেই কথাগুলো মনে পড়ে, আমার কান ঝংকৃত করে, তিনি বলতেন, "তোমরা আমল করে দেখো। তাহলে আয়াত আর হাদীস নিজেরাই নিজেদের অর্থ তোমাকে বুঝিয়ে দেবে।"

* * *

www.pathagar.com

## জেনারেল আকবর খানের সাথে কথাবার্তা

এ কারাজীবনের আরও একটি চমকপ্রদ কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে আব্বা বলেন, একদিন দুপুরবেলা আমার কামরার পাশের কামরা থেকে একজন বললো, 'এই কে আছো, জেনারেল সাহেবের খাবারটা ধরো।' আমার কামরার কয়েদী গিয়ে জবাব দিয়ে বললো কে ? দেয়ালের অপর পাশ থেকে একটি থালার মধ্যে রুমালে পেচানো রুটি, তরকারী ও সালাতসহ ছোট দুটো বাটি কয়েদী ধরে নীচে রাখলো। আর সাথে সাথে দেয়াল টপকে লাফ দিয়ে পড়লেন জেনারেল মুহাম্মদ আকবর খান (ষড়যন্ত্রমূলকভাবে রাওয়ালপিন্ডি ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত)। আমার কামরায় অবতরণ করে জেনারেল আকবর খান বললেন, আমি আপনার সাথে খাবো।

খাবার দাবার সেরে জেনারেল আকবর খান দীর্ঘক্ষণ বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলতে থাকলেন। এক পর্যায়ে বললেন, 'মাওলানা সাহেব, এক আধ দিনের দেরী হয়ে গেলো।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কিসের দেরী হলো ?

জেনারেল আকবর খান বললেন : শ্রীনগর জয় করতে মাত্র এক দিন বাকি ছিল। আমরা শ্রীনগরের উপকণ্ঠে পৌঁছে গিয়েছিলাম। আমাদের কষ্টে অর্জিত বিজয় রাজনীতিকরা আলোচনার টেবিলে বসে হেরে গেছে। আর বিজিত এলাকাসমূহ ফেরত দিয়ে দেয়া হয়েছে ভারতকে। যে অঞ্চলসমূহের প্রতি ইঞ্চি মাটিতে আমাদের জওয়ানরা রক্ত ঝরিয়েছে। তা আমরা ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছি শাসক গোষ্ঠীর ভুলে। এরপর জেনারেল আকবর রাওয়ালপিন্ডি ষড়যন্ত্র মামলা প্রসঙ্গে বলেন : এ ষড়যন্ত্র খোদ আমাদের বিরুদ্ধে। বরং পাকিস্তানি জাতির বিরুদ্ধে করা হয়েছিল। আর্মি ইনচার্জ অফিসাররা যথা সময় শাসকদের কাছে যোগ্য-সৎ ও দেশ প্রেমিক চরিত্রবান সেনা অফিসারদের একটি তালিকা দিয়ে যায়। বুযদিল শাসকরা তাদের সকলকেই রাওয়ালপিন্ডি ষড়যন্ত্র মামলায় ফাঁসিয়ে দেয়। যাতে মদ্যপ, নেশাগ্রস্ত' ক্লাবপ্রিয়' জুয়াড়ী ও জুনিয়র অফিসারদের সুদর্শনা স্ত্রীদের উপর লোলুপ দৃষ্টিদানকারী অফিসাররা সিনিয়ারিটির জোরে প্রমোশন পেয়ে দেশ জাতির সর্বনাশ করতে পারে।" জেনারেল আকবর সাহেব নিজের মনের বোঝা হাল্কা করলেন। এরপর যেভাবে এসেছিলেন ঠিক সেভাবেই দেয়াল টপকে নিজ কামরায় ফিরে গেলেন।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় দিন আবার একই ঘটনা ঘটলো। জেনারেল সাহেবের কয়েদী উচ্চৈস্বরে বললো, "জেনারেল সাহেবের খানা ধরো।" এদিক থেকে তার খাবার ধরার সাথে সাথে জেনারেল আকবর খান আবার দেয়াল টপকে চলে আসলেন আমার কামরায়। এবার তিনি এক ভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনা করতে লাগলেন। তিনি বললেন, যখন কমিউনিষ্ট রাশিয়ার কাছ থেকে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের কাছে আমন্ত্রণ এসেছিল, ঠিক একই সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও আমন্ত্রণ করে। প্রশ্ন সৃষ্টি হয় রাশিয়ার আহ্বান কেন গ্রহণ করা হলো না ? তিনি আরও বললেন, যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজিবাদী ব্যবস্থা রাশিয়ার কমিউনিষ্ট থেকে বেশী ভয়ানক। এরপর তিনি আরও অনেক কথাই বলে গেলেন অব্যাহতভাবে। তিনি নিজেই প্রশ্ন উত্থাপন করতেন আবার নিজেই এর জবাব দিতেন।

ইতোমধ্যে কারা কর্তৃপক্ষ টের পেয়ে গেল এসব ঘটনা। কে যেন তাদের খবর দিয়েছিলো যে, জেনারেল আকবর খান দেয়াল টপকে আমার কামরায় এসে ঘন্টার পর ঘন্টা আলাপ করতে থাকেন। আলোড়িত হয়ে উঠলো পুরো মুলতান জেল। খবর পাবার কয়েক ঘন্টার মধ্যে রাওয়ালপিন্ডি ষড়যন্ত্র মামলার সমস্ত আসামীকে অন্যান্য কারাগারে স্থানান্তর করে দেয়া হলো। মুলতান কারাগার ত্যাগ করার সময় পুলিশের ভ্যানে উঠতে গিয়ে জেনারেল আকবর খান জোরে জোরে শ্লোগান দিতে থাকেন। যার একটি হলো 'আব ওয়াক্তে শাহাদাত আয়া' (অর্থ : এখনই শাহাদাতের সময়)। আমাদের দু-জনের আলাপচারিতাকে সরকার মনে করে বসলো বিপজ্জনক সংলাপ। সরকার হয়তো মনে করেছিল এ দুজনে মিলে না জানি কোনো 'কারা-ষড়যন্ত্র' করে বসে।

* * *

www.pathagar.com

## গবেষণা কর্ম : ভাই, পরিজন, সমাজ, দল ও জীবন

বাড়ীতে যখনই ব্যস্ততার কারণে অথবা অন্য কোনো কারণে আব্বার তাফহীম লেখায় ব্যাঘাত ঘটতো তখনই তিনি আমাদের বলতেন, "তোমরা আমাকে তাফহীমুল কুরআন লিখতে দিচ্ছ না, মনে হচ্ছে আমি খুব তাড়াতাড়ি আবার কারাগারেই যাব। তাফহীমুল কুরআন লেখার কাজে যখনই ভাটা পড়ে তখন আল্লাহ পাক আমাকে কারাগারে নিয়ে যান। ওখানে গিয়ে আমি নিশ্চিন্তে লিখতে পারি।" নিজের মনের ইচ্ছা ও আকাঙ্খা ব্যক্ত করে বলতেন, তাফহীমুল কুরআন লেখা শেষ হলে তাফহীমুল হাদীস লেখায় হাত দিব।

আমাদের বড় চাচা (সাইয়েদ আবুল খায়ের মওদূদী) প্রায়ই আব্বাকে পরামর্শ দিতেন রাজনীতি চর্চায় বেশী সময় ব্যয় না করে লেখাপড়া ও জ্ঞান চর্চা করতে। একদিনের ঘটনা, বড় চাচা আব্বাকে বললেন, তাফহীমের প্রথম দুটি জেলদ আরেকবার দেখে দাও। মানে একটু পরিমার্জনের জন্য। আব্বা সেদিন জবাবে বলেছিলেন ১ম ও ২য় জেলদ পরিমার্জন বা পরিবর্ধন করলে তৃতীয় জেলদ পরিমার্জনের দাবীও উঠবে এবং এই সিলসিলা চলতেই থাকবে।

জামায়াতে ইসলামীর দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে মিছিল-মিটিং আর জনসভা ইত্যাদি কাজে আব্বা ব্যস্ত হয়ে পড়লে বড় চাচা আব্বাকে বুঝিয়ে বলতেন, এসব কাজ অন্যরাও করতে পারে কিন্তু তোমার মতো লেখার কাজ কয়জনে করতে পারবে বলো ? আর যে মানের কাজ তুমি করো, সেটা কয়জন পারবে। তিনি আব্বাকে নসীহত করে বলতেন, সমস্ত সময় যেন লেখার কাজেই ন্যস্ত থাকে। একবার বড় চাচা জামায়াতের এক নেতাকে বললেন, "এই যে তোমাদের মাওলানা সাহেব, সে তো আমার ছোট ভাই। আমি ওকে কোলে-পিঠে মানুষ করেছি, লালন-পালন করেছি। ওর অনেক জিদ আমি পূরণ করেছি। তোমরা যখন ওকে সভা-সমিতি আর মিটিং মিছিলে ব্যস্ত করে তোল, তখন আমার খুব দুঃখ হয়। এর কারণ এতে তার সময় নষ্ট হয়। সে যদি জ্ঞান-গবেষণা ও লেখনীর কাজ স্বাচ্ছন্দ্যে চালাতে পারে তাহলে এর দ্বারা আগামী কয়েকটি প্রজন্ম উপকৃত হবে।

এসব কারণেই আম্মা আমাদের ভাইবোনদের জোর দিয়ে বলতেন, তোমাদের আব্বাজানকে বিরক্ত করো না। আমাদের কেউ যখন কোনো কিছুর জন্য আব্বাকে তাগাদা দিত তখন আম্মা আমাদের বুঝাতেন। বুঝিয়ে

www.pathagar.com

বলতেন, আচ্ছা বলো, আমি যদি সারাক্ষণ তোমার আব্বাকে বলতাম আমার এটা চাই, ওটা চাই, আমার সন্তানদের এটা কিনতে হবে, ওসব করে দিতে হবে, তাহলে তিনি যতগুলো বই লিখেছেন তা লিখতে পারতেন না। তোমাদের আব্বাজান একজন রিসার্চ স্কলার, একজন লেখক-চিন্তাবিদ। তার প্রয়োজন শান্তিপূর্ণ নীরবতা ও পূর্ণ সন্তুষ্ট জীবন। তোমরা তার কাছে কোনো দাবী-দাওয়া করবে না, আর নিজেদের লেখাপড়ার সমস্যা নিয়েও তার সাথে কথা বলবে না, কেমন ।..... তোমাদের কাজকর্মে ওনাকে জড়াবে না। আম্মা নিজগুণে এভাবেই আব্বার জন্য চিন্তা-গবেষণা ও লেখার পরিবেশ তৈরী করে রেখেছিলেন। ফলে আব্বা যাই লিখতেন তা একাগ্রচিত্তে ও নিবিষ্ট মনে লিখতেন।

আব্বাজান মোনাফিকী, রিয়াকারী, মেকী-মিথ্যা-কপটতা ও দেখানোপনার ঘোর বিরোধী এক অনন্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। একবার খাবার টেবিলে আমাদের সব ভাইবোনকে আর বিশেষভাবে মোহাম্মদ ফারুককে (জন্ম ২৭ নভেম্বর ১৯৪৩ দিল্লী) উদ্দেশ্য করে আম্মা বললেন, "বেটা ঠিকমতো নামায আদায় করো। তোমরাই যদি ঠিকমতো নামায না পড় তাহলে লোকে কি বলবে ? মাওলানা মওদূদীর ছেলেমেয়েরাই ঠিকমত নামায আদায় করে না।" আব্বা খাওয়ার ভেতর চুপ থাকলেন, কিছুই বললেন না। খানা সেরে বেসিনে হাত ধুয়ে পানের কৌটা হাতে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বললেন, লেকিন বেটা যাবভী নামায পড়হনা, খোদা কী নামায পড়হনা, আপনি বাপকী পড়হনে কে লিয়ে খাড়ে না হো না।" (অর্থাৎ কিন্তু বাবা দেখো! যখনই নামায পড়বে আল্লাহর জন্যই পড়বে, নিজের পিতার জন্য নামাযে দাঁড়িয়ো না।) এরপর আব্বা নীরবে অফিসের দিকে চলে গেলেন। ছোট একটি বাক্য বা বাক্যাংশ দিয়ে আব্বা ব্যাপক অর্থবোধক কথা বলে দিতেন। তর্কবিতর্ক করা ছিল তার স্বভাব বিরুদ্ধ।

আব্বা জীবনে অনেক লিখেছেন। তার লেখা পুস্তকসমূহ একত্র করে যদি পাতার সংখ্যা হিসাব করা হয় তাহলে দেখা যাবে তিনি প্রতিদিন কত পৃষ্ঠা লিখে গেছেন। অন্যদিকে আমরা যদি তার রাজনৈতিক জীবনের দিকে তাকাই, তাহলে দেখবো কত ঝড়-ঝাপ্টা আর উত্থান-পতন, চড়াই-উতরাইয়ের মুখোমুখি তিনি হয়েছেন সারা জীবন। এর ভেতর এত গবেষণামূলক কাজ তিনি কিভাবে করলেন ? এ কাজসমূহ পরিপূর্ণ মানসিক প্রশান্তি ও একাগ্রতা ছাড়া করা ছিল প্রায় অসম্ভব। মানসিক প্রশান্তি দেয়ার ক্ষেত্রে আম্মা বিশাল অবদান রেখেছিলেন।



www.pathagar.com

তাফহীমুল কুরআনের সূরা ইউসুফের তাফসীর পড়লে মনে হয় যেন তাফসীরকারক সেখানে উপস্থিত হয়ে চলতি ধারাবর্ণনা দিচ্ছেন। সূরা আল্ ফীল ও সূরা আল্ কাহ্ফ পড়তে গিয়েও আমার অনুভূতি এমনই হয়েছে। বরং মনে হয়েছে আব্বার চিন্তা-ভাবনা যুগের পরিসীমা ছাড়িয়ে সেই যুগে প্রবেশ করেছিল যে যুগে ঘটনাগুলো ঘটেছে।

অন্য একটি ঘটনা। খুব বেশী দিনের কথা নয়, আমি তখন জেদ্দায় সৌদি মহিলা কলেজে কর্মরত। একদিন সেই কলেজের আরবী বিভাগের প্রধান সিরীয় বংশোদ্ভূত এক ভদ্রমহিলা জানতে চাইলেন, একটি বাক্যে তোমার আব্বার গুণ বর্ণনা করো। আমি স্বতস্ফূর্তভাবে বলে উঠলাম :

اِنَّهُ كَانَ يَعِيشُ فِيْ عَالِمِ الثَّانِي

অর্থাৎ তিনি এক ভিন্ন জগতের অধিবাসী ছিলেন। আমার উত্তর শুনে তিনি দারুণ খুশী হয়ে বলেছিলেন ইমাম ইবনে তাইমিয়ার বৈশিষ্ট্য এমনই ছিল।

আমরা ভাই-বোনেরা সবাই একত্রে বসে আব্বার সাথে খাওয়া দাওয়া করতাম। আব্বা নিজেও চাইতেন যেন খাবার টেবিলে আমরা সবাই উপস্থিত থাকি। সন্তানদের সাথে সাক্ষাতের ও কথাবার্তা বলার এটাই ছিল একমাত্র সময়। তিনি এতটাই সময়ানুবর্তী ছিলেন যে, ঘড়ির কাঁটাও তার কাছে হার মানতো। এজন্য আব্বা খেতে আসবার পূর্বেই আমরা ভাইবোনেরা নিজ নিজ আসন গ্রহণ করে নিতাম। খাবার টেবিলে আব্বাকে দেখলে মনে হতো তিনি খাচ্ছেন আমাদের সাথে ঠিকই, কিন্তু কি যেন চিন্তা করছেন।

আব্বা আমাদের প্রায়ই নসীহত করে বলতেন, মানুষ হলো ভালো মন্দের মিশ্রণ। আদর্শ আদম সন্তানের বৈশিষ্ট্য হলো অপরের উত্তম দিক ও চরিত্র থেকে কিছু অর্জন করা আর অপরের মন্দ দিক থেকে নিজেকে রক্ষা করা। প্রকৃত মূর্খ হচ্ছে সেই লোক যে অন্যের মন্দ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় কিন্তু ভালো বা উত্তম বিষয়বস্তু থেকে বঞ্চিত থেকে যায়।

কড়া কথা বলা কিংবা কাউকে আঘাত করে বক্তব্য, বিবৃতি দেয়া তার চরিত্রে ছিলই না। কাউকে কোনো কড়া কথা বললেও তখনই বলতেন যখন তিনি খুব বেশী আঘাত পেতেন, আর সে বাক্যটি ছিল এরূপ ঃ তাদের নিকট আমার ভদ্রতাই হচ্ছে আমার সবচেয়ে বড় অপরাধ। তাই তিনি সব সময় মানব চরিত্রের ভালো দিকটির প্রতি আবেদন করে উত্তম

www.pathagar.com

ও ভালোকে জাগিয়ে তুলে ভালোর দ্বারা মন্দকে অপসারণ করতে চাইতেন। জীবনের পুরো সময়টাই তিনি ভালো আর সত্যের জয়ের জন্য কাটিয়েছেন। এজন্য সংগ্রাম-সাধনা করে গেছেন। পুরো মুসলিম জাতিকে জাগ্রত করার দূর্বার সংগ্রাম করেছেন প্রায় পৌনে একশত বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে।

আমি মাঝে মধ্যে চিন্তা করি যদি আব্বার বিয়ে কোনো জাহিল ও ঝগড়াটে মহিলার সাথে হতো, তাহলে কি হতো ? আম্মাজানকে আল্লাহ পাক তৈরী করেছিলেন আববার জন্যই। আম্মার উচ্চাঙ্গের সাহিত্যবোধ, জ্ঞান অর্জনের অনুরাগ আর জ্ঞান বিতরণের প্রবণতা, নিজের ব্যাপারে দাবীহীন, নিঃস্বার্থ আর আব্বার হৃদয় জয় করার ক্ষেত্রে সীমাহীন প্রচেষ্টা তাকে এক মহীয়সী নারীতে রূপান্তরিত করে। আরবী ভাষায় একটি প্রবাদ আছে "আল্ বানাতু উদ" অর্থ নারীরা সুগন্ধীযুক্ত চন্দন কাঠের মতো'। মহিলারা নিজেরা পর্দার ভিতরে থাকার পরও তাদের পর্দানশীন চাল-চলন, তাদের আত্মসম্মানবোধ সর্বোপরি শিশুদের লালন করে শিক্ষিত করে প্রকৃত মানুষ করলে তা সবার নজর কাড়ে। সকলেই তখন বাহবা দেয়। সুগন্ধ যেমন দেখা যায় না অনুভব করা যায়, আদর্শ নারী তেমন হয়ে থাকে।

আমাদের পড়ালেখা ও শিক্ষা জীবন নিয়ে আলোচনা প্রসংগে আব্বা আমাদের প্রায়ই বলতেন, সুযোগ পেলে আমি তোমাদের পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষিত মানুষে পরিণত করতাম। যেহেতু আমি তোমাদের সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করাতে পারিনি তাই তোমাদের নিকট জবাবদিহিতা তলব করবার হক আমার নেই। আমি আমার জীবন ও সময় দীনের কাজে আর আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করবার উদ্দেশ্যে ওয়াকফ্ করে দিয়েছি। এজন্য তোমাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ আল্লাহর হাতে সোপর্দ করে দিয়েছি। নিজের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আব্বা এভাবেই আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার জন্য ডিউটি করে গেছেন।

ইন্তেকালের কয়েকমাস আগের ঘটনা। এক ভদ্রলোক সাক্ষাত করতে এসে আব্বার সরাসরি কড়া সমালোচনা করলেন। তার সমালোচনার ভাষা ছিল হৃদয়হীন। নানা কথার মধ্যে তিনি আব্বাজানকে বললেন, 'আয়াতুল্লাহ খোমেনী (মৃত্যু : ৪ জুন ১৯৮৯) অত্যন্ত সফলভাবে ইরানে ইসলামী বিপ্লব করে ফেললেন, আপনি পাকিস্তানে ইসলামী বিপ্লব করতে পারলেন না কেন ?

আব্বাজান এতসব সমালোচনামূলক কথার জবাবে বললেন, "আমি আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার কাজে রোজ হিসেবের দিনমজুর।" আমার ভাগের

www.pathagar.com

কাজ শেষ করে মালিকের কাছ থেকে পারিশ্রমিক নেয়াই আমার দায়িত্ব। এখন বিল্ডিং বা ইমারত নির্মাণ কবে পূর্ণ হবে আর কিভাবে হবে? ইমারত নির্মাণ সম্পূর্ণ হবে কি হবে না? এতে দিনমজুরের কি যায় আসে। দিনমজুরের দায়িত্ব ঈমানদারীর সাথে নিজের ভাগের ডিউটি পালন করা।

আব্বা যা বলেছিলেন তার জীবন ছিল তেমনি। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত দীন প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যয় করে আব্বা তার ভাগের ডিউটি পুরো করেছিলেন। নিজ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বক্তৃতা ও লেখনী, চিন্তা-কর্ম প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি হক আদায় করেছেন। তিনি 'জিন্দাবাদ' শ্লোগানের প্রত্যাশি ছিলেন না আর মুর্দাবাদকে (ধ্বংসহোক, নিপাত যাক) ভয় পেতেন না। একজন সাধারণ মানুষের সাথে তুলনা করলে মনে হয় যেন তার নিজ সত্তা, তার দেহ, তার প্রয়োজনসমূহ, তার সন্তান-সন্ততি ও তাদের ভবিষ্যৎ তার কাছে কোনো গুরুত্বই রাখতো না। জীবনভর আব্বাজান যেভাবে অমুখাপেক্ষী ছিলেন তা অন্য কারো জীবনে আমরা দেখিনি।

* * *

www.pathagar.com

## সাইয়েদের সাত বৈশিষ্ট্য

দাদী আমাদের বলতেন আসল সাইয়েদের মধ্যে কয়েকটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য থাকা অত্যাবশ্যক। কেউ যদি তোমাদের বলে আমি সাইয়েদ, তাহলে তাকে সাতটি বিষয়ে পরখ করে নেবে।

১. সাইয়েদ কখনো ক্রোধান্বিত হয় না। যদি তার ক্রোধ জাগ্রত হয় তাহলে শুধু দীনের জন্য হয়।
২. সাইয়েদ কখনো ব্যক্তিগত প্রতিশোধ নেয় না।
৩. গালির জবাবে সাইয়েদ গালি দেয় না।
৪. সাইয়েদ কারো ব্যাপারে মনে ঘৃণা-বিদ্বেষ লালন করে না।
৫. সাইয়েদ মিথ্যা কথা বলে না এবং কারো গীবত করে না।
৬. সাইয়েদ কখনো খাবারের মধ্যে দোষ-ত্রুটি ধরে না। সে চরম ক্ষুধা ও পিপাসায়ও অসহিষ্ণু হয় না। সামনে যা পরিবেশন করা হয় তা খেয়ে ধৈর্যধারণ করে আল্লাহর শোকর আদায় করে।
৭. সাইয়েদের উপর জীবনে অন্তত একবার কঠিন পরীক্ষা আসে, এমনকি তার জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু সে বিপর্যস্ত হয় না, সাহস হারায় না বরং সর্বপ্রকার সংগ্রামে সংঘাতে দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

দাদীর বর্ণনা করা গুণ বৈশিষ্ট্য ছিল আমাদের চরিত্র ও জীবন পরিশীলিত করে গঠনের জন্যই। তার নাতি-নাতনিরা যেন আত্মগঠনের সময় একটি মানকে সামনে রেখে এগুতে পারে সে জন্যই তিনি বোধ হয় এসব বলেছিলেন। তবে সত্য হলো উপরোক্ত সাতটি গুণ ও বৈশিষ্ট্য আব্বার জীবন ও চরিত্রে পূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল। আব্বা এতটাই নম্র মেজাজের ছিলেন যে, তিনি সহজে রাগান্বিত হতেন না। একজন মানুষ যেসব ঘটনায় ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে পড়তো—এমন পরিস্থিতিতে আব্বাকে দেখেছি চরম ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। কারো ব্যাপারেই তিনি মনে ঘৃণা-বিদ্বেষ অথবা প্রতিশোধ স্পৃহা লালন করতেন না।

মৃত্যুদণ্ড দানকারী বিচারক কিংবা কারাগারে নিক্ষেপকারীদের সাথেও আব্বা সবসময় সৌজন্যমূলক আচরণ করে গেছেন। পরবর্তী সময়ে তাদের কেউ যখনই কোনো প্রয়োজনে সাক্ষাত করতে এসেছেন আব্বা তাদের সাথে স্বভাবসুলভ আন্তরিকতার সাথেই মোলাকাত করতেন। তিনি আলোচনার কোনো পর্যায়েই তাদের আগেকার কাজকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস পর্যন্ত করেননি।

www.pathagar.com

একদিন এক ভদ্রলোক আব্বার কাছে আসলেন সুপারিশ নিতে। তিনি তখন অবসরে থাকার কারণে কিছুটা আর্থিক দৈন্যের মধ্যে দিনাতিপাত করছিলেন। আব্বার সুপারিশ নিতে এসেছিলেন দুবাই বা আবুধাবী গিয়ে চাকুরী করার জন্য। আব্বাও তার স্বভাবসুলভ ভদ্রতার নিদর্শনস্বরূপ সেই অবসর প্রাপ্ত ভদ্রলোককে একটি সুপারিশ পত্র লিখে দেন, যে পত্র প্রবাসে তার প্রভুত উপকারে আসে এবং তিনি একটি ভালো চাকুরীও পেয়ে যান। কে ছিলেন সেই ভদ্রলোক ? সামরিক আইনে যখন আব্বার কোর্ট মার্শালে প্রাণদণ্ড দেয়া হয় তখন এ ব্যক্তিই ছিলেন সামরিক আদালতের বিচারক। আজও তার স্বাক্ষর মৃত্যুদণ্ডাদেশে রক্ষিত হয়ে কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণাকারী সামরিক আদালতের বিচারকের জন্য সুপারিশ এ মহান চরিত্র বৈশিষ্ট্য এ যুগে কেবল আব্বার ললাটেই শোভা পায়।

জেনারেল মুহাম্মদ আযম খান নিয়মিত দেখা করতে আসতেন। অথচ এ আযম খানের আমলেই আব্বার কোর্ট মার্শাল হয়েছিল। আব্বা যেন ঈসা আ.-র একটি কথার উপর আমল করতেন। হে মৎস্য শিকারীগণ! আসো আমি তোমাদের মানুষ শিকারের পদ্ধতি শিখিয়ে দেই। নিজের চরিত্র কর্ম ও আচরণ দ্বারা মানুষকে বশীভূত করে আল্লাহ পাকের বন্দেগীর জালে আবদ্ধ করো নিজের জালে নয়।

তিনি চরিত্র ও আচরণ দ্বারা তথা উত্তম চরিত্র বৈশিষ্ট্য দ্বারা প্রাণের শত্রুর হৃদয়েও আসন করে নেন। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আব্বার নগ্ন সমালোচক ভূট্টো সাহেবের ব্যাপারেও তিনি সবসময় ভালো কথাই বলেছেন। জুলফিকার আলী ভূট্টোর নাম অত্যন্ত সম্মানের সাথেই উচ্চারণ করতেন আব্বা। আর ভূট্টো সাহেবের ব্যাপারে বলতেন, 'আল্লাহ তা'আলা তাকে ভালোপথে পরিচালিত করুন ও পরিস্থিতি উত্তরণে সহায়তা করুন। যাতে করে দেশ ও জাতি রক্ষা পায়।'

আব্বাজান জীবনে কখনও গালির জবাবে গালি দেননি। এমনকি গালি প্রদানকারীকে কড়া কথাও বলেননি। আমাদের ছেলেবেলার একটি ঘটনা। ইছরার একটি মসজিদে আব্বা জুমুআর নামায আদায় করেন। সেই জুমু'আর মসজিদের খতিব ছিলেন আব্বার চরম বিরোধী। সেই খতিব তার সম্পূর্ণ খুতবায় আব্বার এবং তার আন্দোলনের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেন। অথচ আব্বা তখন তার সামনে বসেছিলেন একজন মুসল্লী হিসেবে। খুতবার উপসংহারে এসে খতিব সাহেব (ফতোয়া দিয়ে) বললেন, 'যদি কোনো মওদূদীবাদী মারা যাবার পর তার কবরের উপর উৎপন্ন ঘাস কোনো ছাগল খায়, তাহলে সেই ছাগলের দুধ পান করাও হারাম।' আব্বার সাথে

www.pathagar.com

যেই ভাইয়েরা নামায পড়তে গিয়েছিলো তারা খতিবের বক্তব্য নিয়ে হেসে লুটোপুটি খাচ্ছিল আর আমাদের শোনাচ্ছিল জুমুআর খুতবার মূল বিষয়বস্তু। অথচ আব্বা একপাশে গম্ভীর চিন্তামগ্ন মনে বসেছিলেন বরং আমাদের দেখেই তিনি অবাক হচ্ছিলেন, এই ভেবে হয়তো এও কোনো হাসির কথা হলো।

আরও একটি অনুরূপ ঘটনা এখানে উল্লেখ করছি। জামেয়ায়ে আশরাফিয়া লাহোরের এক উঁচুমাপের আলেমে দ্বীন একদিন আব্বাকে বললেন, মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী রহ. (মৃত্যু ২২ ফেব্রুয়ারী ১৯৬২) আপনার সমালোচনা করেছেন কিন্তু আপনি কোনো উত্তর দিলেন না কেন ? এ ধরনের নীরবতা ও চুপ থাকায় আপনার ব্যাপারে সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি হচ্ছে। আব্বা তাকে বললেন, যে ব্যক্তি বিনা কারণে আমার সমালোচনা ও নিন্দা করে তার জন্য আমার দুঃখ হয়। তবে মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী সাহেবের ব্যাপারটা আলাদা। তার নেকীর পরিমাণ এতো বেশী যে এই খামাখা সমালোচনার কারণে হয়তো সেখান থেকে কিছু সদকা হয়ে আমার দিকে চলে আসবে, আর আমার আমলের কিছু অপূর্ণাংগতা আমার নীরবতার কারণে দূর হয়ে যাবে।

ক্ষুৎ-পিপাসার উপর ছিল আব্বার দারুণ কন্ট্রোল। তিনি খাবারের মধ্যে কখনো দোষ ধরতেন না। খাবারে লবণ না হলে বা কম হলে তিনি সবর ও শোকরের সাথে খানা খেয়ে নিতেন। আমাদের কারো মুখ দিয়ে যদি অভিযোগ উত্থিত হতো তাহলে বলতেন, প্রতিদিন প্রতি বেলায় রান্না ঠিকই আছে, একদিন যদি কোনো কিছুর অভাব থেকে যায় তাতে কষ্ট হবার কি আছে! আব্বার দেখাদেখি আমরাও সব ভাইবোন লবণ মরিচের কমবেশী হবার কিংবা অন্য কোনো দোষ-ত্রুটি ধরা ছেড়েই দিয়েছি। তথাপি হঠাৎ যদি কারো দ্বারা ত্রুটির কথা প্রকাশিত হয়ে পড়তো, তাহলে তৎক্ষণাৎ দাদী বলে বসতেন–

*ইয়ে নকলী সাইয়েদ হ্যায়। বালকে নও মুসলিম বেচারা কেয়া কারে আপনি আদত ছে মজবুর হ্যায়।*

অর্থ : এ তো নকল সাইয়েদ, বরং নওমুসলিম। কি করবে বেচারা পুরনো অভ্যাস ছাড়তে পারছে না।

এর ফলে ভয়ের চোটে খাবার টেবিলে কেউ রান্নার ত্রুটি আবিষ্কারের সাহসই করতো না। দাদীর ইন্তেকালের পরও আমাদের খাবার টেবিলের কালচার এমনই ছিল, যেই খাবার ত্রুটি ধরতো সেই নকল সাইয়েদ ও 'নওমুসলিম' উপাধি লাভ করতো।

www.pathagar.com

# ফিলিস্তিনী প্রতিনিধি দলের আগমন ও আপ্যায়ন

পঞ্চাশের দশকের কথা। ফিলিস্তিনী মুসলমানদের একটি প্রতিনিধি দল পাকিস্তান সফরে আসে এবং তারা আব্বার সাথে সাক্ষাত করার আগ্রহ প্রকাশ করে। ফলে তাদেরকে বিকেলে চা-চক্রের আমন্ত্রণ জানান আব্বা। তাদের আসার কয়েক ঘন্টা পূর্বে আমরা জানতে পারলাম প্রতিনিধি দলে বেশ কয়েকজন মহিলা রয়েছেন। আমাদের পারিবারিক পরিবেশে নারী-পুরুষের সম্মিলিত সমাবেশ-বৈঠকের কোনো অবকাশই ছিল না। ফলে আব্বা অন্দরমহলের লনে (উঠানে) খোলা আসমানের নীচে মহিলাদের বসার ব্যবস্থা করেন। আব্বা ঘরের মেয়েদের ডেকে বলে দেন যে, আগত মহিলা মেহমানদের অভ্যর্থনা আপ্যায়ন আর মেহমানদারী আপনাদেরই করতে হবে।

সময়টা ছিল বর্ষার। ডেকোরেটরের লোকেরা যখন টেবিল চেয়ার সাজাচ্ছিল তখন ঘন-কালো মেঘ করে আকাশ অন্ধকার হয়ে আসে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেল যেন এই বৃষ্টি শুরু হয়। তখন আমরা আব্বাকে বললাম, মেহমানদের লনে বসানোর পর যদি বৃষ্টি নামে তাহলে কেমন একটা হ-য-ব-র-ল অবস্থা হবে। আব্বা অত্যন্ত আত্ম প্রত্যয়ের সাথে বললেন, ইনশাআল্লাহ্ বৃষ্টি হবে না। তখন আমরা বললাম, আকাশ অন্ধকার, বৃষ্টি শুরু হয় হয় ভাব। অতঃপর আব্বা আবার বললেন, বৃষ্টি হবে না ইনশাআল্লাহ্। এরপর দেখতে দেখতে মেঘ কেটে গেল। নীল আকাশ ভেসে উঠলো অন্ধকার দিনের পর এমন মনোমুগ্ধকর বায়ু প্রবাহিত হলো যেন উৎসবের আয়োজনে চা-চক্র জমে উঠলো। মেহমানরা আসলেন, আরাম করে বসলেন, তারপর চা-পান করে তারা চলে গেলেন। লন থেকে সবকিছু তুলে ফেলার পর আবার আকাশ মেঘে মেঘে ঢেকে গেল। এরপর শুরু হলো বৃষ্টি। মুষলধারে বৃষ্টিপাত চললো সারারাত।

সেদিন আম্মা আমাদের বললেন, আম্মা আর তার ছেলেকে (মানে দাদী আর আব্বা) ঠিকমতো বুঝে নিও। তারা যা বলেন তা চুপচাপ মেনে নিও। তাদের সাথে কোনো বিষয়ে তর্কবিতর্ক করবে না। তারা যা কিছুই বলেন, আল্লাহ্ প্রায়ই তা পুরো করে দেন। এরপর আম্মা আমাদের নিম্নোক্ত হাদীস দুটো শোনালেন ঃ

www.pathagar.com

হযরত আনাস রা. কর্তৃক বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ স. বলেন, আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে এমন কিছু বান্দা আছে যারা আল্লাহর নামে কসম খেয়ে কিছু বললে আল্লাহ তা সম্পূর্ণ করে দেন।

হারেসা ইবনে ওহাব রা. বলেন, আমি নবী কারীম স.-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন,.....এমন নিঃস্ব-দুর্বল ব্যক্তি যে দারিদ্রতার কারণে অন্যের কাছে তুচ্ছ ও অবহেলিত। যদি সে আল্লাহর নামে কসম করে তা এ আকাঙ্খা ভংগ করে যে, এর মাঝে আল্লাহর অনুগ্রহ নিহিত আছে। তখন আল্লাহ তার যেনো আশা পূর্ণ করেন।—(বুখারী)

* * *

www.pathagar.com

## দাদীর বিদায় ও ইছালে সওয়াব

১৯৫৭ সালের ৬ ও ৭ ডিসেম্বরের মধ্যবর্তী রাত ২টার সময় সামান্য অসুস্থতার পর দাদী ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন'। 'মান মারিযাম তু তাবিবাম' (আমি রোগী আর তুমি শেফাদানকারী) বলে শাফীয়ে আ'লার কাছ থেকে যে মহীয়সী নারী আরোগ্য লাভ করতেন তিনি তার প্রকৃত শেফাদানকারীর সান্নিধ্যে চলে গেলেন।

দাদীর ইন্তেকালের পর সাধারণ মানুষ ভেবেছিল মায়ের বেটা এতবড় আলেমে দীন নিশ্চয়ই কুলখানি আশরা (দশদিন) বিশরা (বিশদিন) আর চেহ্লাম অনুষ্ঠিত হবে। মায়ের ইছালে সওয়াবের জন্য ছেলে নিশ্চয়ই বিরাট ডেকচি ভরে বিরানী জর্দা রান্না করে মানুষকে খাওয়াবে। সবাই অবাক তাকিয়ে দেখেছে দাদীমার জন্য আব্বা কুলখানিও করাননি কিংবা কোনো ধরনের বিদআত কাজও করেননি। 'যত মুখ তত কথা' মানুষের মুখ তো আর চেপে ধরা যায় না, নানা ধরনের সমালোচনা শুনতে পেলাম আমরা। একজন তো বলেই বসলো, হে আল্লাহ! তুমি সবাইকে নেক সন্তান দিও। কিন্তু এমন সন্তান কোনো শত্রুকেও দিও না যে নিজ মাকে কবরে ফেলে আসার পর ফিরে তাকায় না। আমাদের অন্দর মহলে ও পরিবারের সকলে কথাগুলো দ্বারা দারুণ ব্যথিত হয়েছিল। কিন্তু আব্বা তো আব্বাই। তিনি এসব সমালোচনা শোনার ধারে কাছেও ছিলেন না।

এবার দেখুন মুদ্রার অপর পিঠ। একজন হত দরিদ্র হাঁপানী রোগী রোজ দুপুরে আমাদের বাসায় আসতো এবং তাকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে দুপুরের খাওয়া পরিবেশন করা হতো। কারণ, রোগের প্রচণ্ডতার কারণে সে নিজের রুটি-রুজীর সংস্থান করতে পারতো না। খানা শেষ করে সে আমাদের ঘরেই একটি খাটে শুয়ে পড়তো। আর রাতের বেলা ঠিক দুপুরের ন্যায়ই খাওয়া দাওয়া সেরে নিজ ঘরে ফিরে যেতো। এ বিষয়টি সাধারণ সমালোচকরা জানতোই না। আব্বার নির্দেশ ছিল এ লোকের দুপুরের খাওয়া দাদার ইছালে সওয়াবের জন্য ও রাতের খাবার দাদীর ইছালে সওয়াবের জন্য অত্যন্ত সম্মানের সাথে পরিবেশন করতে হবে। এ বছরই হজ্জের মওসুমে রাবেতা আল আলমে আল ইসলামীর আমন্ত্রণে আব্বা সৌদী আরবে গিয়ে দাদীর ইছালে সওয়াবের জন্য হজ্জ পালন করেন। সাথে সাথে দাদীর নামে কয়েকটি ওমরাহ আদায় করেন।

www.pathagar.com

## তৃতীয়বার কারাবরণ : ৬ জানুয়ারী ১৯৬৪

১৯৬৪ সালের ৬ জানুয়ারী আবার গ্রেফতার হন আব্বা। এবার বই আর পুস্তকে ভর্তি বাক্স জেলে পাঠানো হচ্ছিল। জেল কর্তৃপক্ষ বই ভরা বাক্স দেখে অবাক হতেন। তারা প্রথম শ্রেণীর অন্যান্য কয়েদীদের জন্য হালুয়া-রুটি আসতে দেখতেন আর মাওলানা সাহেবের জন্য বই। আব্বা তখন ছিলেন লাহোর কারাগারে, বর্তমানে সেখানে শাদমান কলোনী অবস্থিত। আমরা প্রতি সপ্তাহে একবার দেখা করতে যেতাম আব্বার সাথে। এবার কারাজীবনের পুরোটা সময়ই আম্মা অসুস্থ ছিলেন। আর দাদীও চলে গেছেন পরপারে। দাদী বর্তমান থাকলে তিনি আম্মার জন্য বিশাল নৈতিক শক্তি যোগাতেন—দাদীর অনুপস্থিতি তখন আম্মা দারুণভাবে অনুভব করতে লাগলেন।

১৯৬৪ সালে গ্রেফতার হবার কিছুদিন পূর্বেই প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের (মৃত্যু: ২০ এপ্রিল ১৯৭৪) সাথে আব্বার এক ঐতিহাসিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় লাহোরের গবর্নর হাউসে। এ সময় পশ্চিম পাকিস্তানের গবর্নর কালা বাগের আমীর মুহাম্মদ খান (মৃত্যু:২৬ নভেম্বর ১৯৬৭) উক্ত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

আব্বাকে উদ্দেশ করে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান বলেন, "মাওলানা ! আপনি রাজনীতি ছেড়ে দিন। দেশ-জাতি ও সরকারের কাজে আপনাকে বড় প্রয়োজন।"

আব্বা জবাবে বললেন. আইয়ুব সাহেব! আপনি সারা জীবন সেনাবাহিনীতে চাকুরী করে এসে আমাকে কোনো যুক্তিতে সামাজিক জীবন থেকে দূরে থাকতে বলছেন ?

আইয়ুব খান বললেন, মাওলানা, রাজনীতি এক নোংরা খেলা। আপনার মতো আলেমের এ খেলায় অংশ নেয়া সাজে না।

আব্বা বললেন, তো আপনি কি মনে করেন এটাকে নোংরা থাকতে দেয়া কি ঠিক ? এতে নোংরামী সৃষ্টিকারীদের পরিবর্তে ভালো মানুষ আসলেই কেবল নোংরামী দূর হতে পারে।

এরপর আইয়ুব খান বললেন, আপনি মিল-ফ্যাক্টরী করুন। সরকার ব্যাংকের মাধ্যমে আপনাকে ঋণ দেবে। তাছাড়া লাইসেন্স পারমিট লাগলে তাও দেয়া হবে। আর আপনি চাইলে যে কোনো আরব রাষ্ট্রে আমরা আপনাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করতে পারি।

www.pathagar.com

আসলে এসকল বিষয়ে আব্বার কোনো আগ্রহ কোনোকালেই ছিল না। তাই আইয়ুব খানকে অবশেষে বললেন, আপনি আমার সম্পর্কে ভুল ধারণা নিয়ে বসে আছেন।

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান বেশ অবাকই হলেন, দুনিয়ার প্রতি আব্বার এ ধরনের নিরাসক্তি দেখে। আব্বাজান প্রায়ই একটি কবিতা পড়তেন যা তার জীবনের কথা বলতো—

*"হাযার দেনে কা এক দেনা হ্যায়*
*এক দিলে বে মুদ্দাআ দিয়া তুণে"*

অর্থ ঃ হাজার দানের একটি দান, (হে প্রভু!)
নিত্যকামনাহীন একটি প্রাণ, তুমি করেছো দান।"

আব্বা একস্থানে লিখেছেন, "ঈমান বিল গায়েব হচ্ছে মনের সেই অবস্থা যার ফলে মানুষ অদৃশ্যকে পাবার জন্য দৃশ্যমান বস্তুকে পরিত্যাগ করে। আখেরাতের সাফল্যের জন্য দুনিয়ার লোভ-লালসা লাভ ত্যাগ করে। পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে ক্ষতিকর লেনদেন করে নেয় এবং তার উপর সন্তুষ্ট থাকে। 'ঈমান বিল গায়েব'-এর বলে একজন মানুষ এ নশ্বর পৃথিবীর সকল আরাম আয়েশ, সুযোগ-সুবিধা, লাভ-ক্ষতি থেকে দূরে বহু দূরে অবিনশ্বর পরকালে জান্নাত লাভে ব্রতী হয়। জান্নাতকে টার্গেট করে সেদিকেই চলে। তার দৃষ্টি থাকে জান্নাতের বাগবাগিচা আর নয়নাভিরাম দৃশ্যের দিকে, সেখানকার ফল-মূল, ছায়াবীথিকা, সেখানকার আরাম আয়েশ, মানে জান্নাতী সুখ সম্ভোগে তার দৃষ্টি উদগ্রীব থাকে।"

তৃতীয়বার গ্রেফতারের পর আব্বার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার একটি সাজানো মামলা পরিচালিত হয়। তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানের হোম সেক্রেটারী আব্বার নামে এক বিশাল অভিযোগ দায়ের করে আদালতে মামলা ঠুকে দেন।

আব্বা যখন আবার মুক্তি পেয়ে আমাদের মাঝে ফিরে আসলেন সারা বাড়ীতে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। একদিন স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানে কর্মরত আমাদের এক আত্মীয় এক বাক্স মিষ্টি হাতে আমাদের বাসায় আসলেন অভিনন্দন জানাতে। কিন্তু এবার তিনি আগের মতো কথাবার্তায় মেতে উঠলেন না। কিছুক্ষণ বসে থেকে চলে গেলেন। তার যাবার পর আমরা আলোচনা করলাম কি ব্যাপার আজ তিনি এমন ভিজে বেড়ালের মতো চলে গেলেন কেন?

আব্বা আমাদের সেই আত্মীয়র আচরণের কারণ বললেন, "জামায়াতে ইসলামী"কে নিষিদ্ধ ঘোষণার পর মামলা চলাকালীন সময়ে আমি

www.pathagar.com

একদিন পুলিশের গাড়ীতে করে হাজিরার জন্য হাইকোর্টে যাচ্ছিলাম। পুলিশ সুপার আমার পাশেই বসে ছিল আর যখন আমাদের গাড়ী হাইকোর্টের গেটের দিকে মোড় নিচ্ছিল তখন এ আত্মীয় ভদ্রলোকের গাড়ীর সাথে আমাদের মুখোমুখি হয়। তিনি নিজেই ড্রাইভ করছিলেন গাড়ী। তার চোখে চোখ পড়ার সাথে সাথে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সালাম দেয়ার জন্য আমার হাত উঠে গেল আর আমি ইশারায় তাকে সালাম দিলাম। তিনি আমার দিকে তাকালেন ঠিকই, কিন্তু সালামের জবাব না দিয়েই গাড়ী হাকিয়ে চলে গেলেন। পাশে পুলিশ সুপারের নজর পড়ে যায়।

এ ঘটনা বর্ণনা করার পর আব্বা আমাদের ভাইবোনদের বুঝিয়ে বললেন, "এ ঘটনা আমি তোমাদের এজন্য বলছি যাতে করে তোমরা এ পৃথিবীর পরিবর্তনশীল বাস্তবতাকে বুঝতে পারো। মনে রেখো, সবধরনের বন্ধুত্ব-মহব্বত, আত্মীয়তা আর সু-সম্পর্ক ততক্ষণ পর্যন্তই থাকে যতক্ষণ মানুষের অবস্থা ভালো থাকে। পরিস্থিতি খারাপ হলে বন্ধু-আত্মীয় সবাই সুযোগ বুঝে কেটে পড়ে।"

আব্বা একথা আমাদের বিশেষভাবে না বুঝালেও আমাদের এতটুকু অভিজ্ঞতা হয়ে গিয়েছিল যে, আমরা কারো বাহ্যিক সৌজন্য প্রদর্শনে অভিভূত হয়ে ধোঁকায় পড়তাম না। আব্বা যখন জেল থেকে মুক্তি পেয়ে আসতেন তখন আমরা হতাম মাওলানা সাহেবের 'সাহেবজাদা' আর 'সাহেবজাদী' আর যখনই কারাগারে যেতেন তখন মনে হতো এ বিশাল পৃথিবীতে আমরা একা। আবার জেল থেকে আসলে মনে হতো আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষীরা উপচে পড়ছে বন্যার পানির মতো।

হয়তো এজন্যই আমরা আগ বাড়িয়ে মানুষের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলি না। বরং কারো এগিয়ে আসার অপেক্ষা করি। এতে অনেকে আমাদের অহংকারী ভেবে থাকেন। কিন্তু কী করবো বলুন ? আব্বাজানের কারণে লোকেরা অপরিচিতজনের সামনে চোখে চোখ ফেলতে, কথা বলতে, কিংবা সম্পর্ক করতে ইতস্ততঃ করতো বরং অপছন্দই করতো। কারণ তারা ভয় পেতো সরকারী গোয়েন্দা নজরদারীতে পড়ে গিয়ে না জানি কি ক্ষতি হয় খামাখা। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ছেলেবেলা থেকে নিজেকে সামলে নিয়ে এবং আগ বাড়িয়ে সম্পর্ক না করার যে সাধারণ রীতি আমরা রপ্ত করেছিলাম তা আজ অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। যা আজ চেষ্টা করেও পাল্টাতে পারছি না।

www.pathagar.com

## সামরিক সরকারের একটি হীন ষড়যন্ত্র : ১৯৬৬ সালের রমযান

১৯৬৬ সালের রমযান মাসের ঘটনা। কিছুক্ষণ পরেই তারাবীর নামায শুরু হবে। লোকেরা তারাবী পড়ার জন্য সমবেত হচ্ছে। অকস্মাৎ ইছরা থানার ওসি হাজির দেখা করার জন্য। ওসি বাসার ভেতর মেসেজ দিল, 'আমার কিছু জরুরী কথা আছে মাওলানা সাহেবের সাথে।' আব্বা তাকে নিজের পড়ার ঘরে ডেকে বসাতে বললেন।

সাথে আগত পুলিশকে বাইরে দাঁড় করিয়ে ইছরা থানার ওসি ভেতরে এসে বসলেন। ওসি যা বললেন তার সারসংক্ষেপ হলো, "আমি উপর থেকে হুকুম পেয়েছি যে অবিলম্বে মাওলানা মওদূদীর পুরো বাড়ী তল্লাশী করো। তার সার্ভেন্ট কোয়ার্টারে একটি অপহৃত কিশোরী আছে তাকে উদ্ধার করতে হবে এবং সাথে সাথে প্রেস ফটোগ্রাফারের খবর দিয়ে মেয়েটির ছবি তুলে প্রেসকে সম্পূর্ণ বিষয়টি অবহিত করো। এরপর ওসি আরও বললেন, "মাওলানা! আপনার সম্মান আমার নিকট নিজ সম্মানের মতো পবিত্র ও প্রিয়, তাই আমি ত্বরীত আপনার কাছে এসেছি। আপনি অবিলম্বে সার্ভেন্ট কোয়ার্টার তল্লাশী করে সেই মেয়েটিকে বাড়ী থেকে বের করে দিন। এখন আমি যাচ্ছি। আবার ১৫-২০ মিনিটের মধ্যেই আসবো পুলিশ ফোর্স, সাংবাদিক-ফটোগ্রাফার সবাই তখন থাকবে। আমি চাই আপনার ও ছেলেদের ইজ্জত নষ্ট না হোক, কারণ কোনো এক পুত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হবে।"

আব্বা এসব শুনে অন্দরমহলে এসে সম্পূর্ণ বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে আম্মাকে বললেন। এর একটু কানাঘুষা আমরা টের পেলাম। আম্মা সাথে সাথে সার্ভেন্ট কোয়ার্টারে গেলেন এবং সকলকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। ওরা আম্মাকে নয়-ছয় বুঝিয়ে বললো, "আম্মা আপনার নুন খেয়েছি। আপনার আর সাহেবের জন্য আমরা জান কুরবান করতে প্রস্তুত। আমাদের দ্বারা একি সম্ভব ?"

এদিকে সময় পার হয়ে যাচ্ছিল বিদ্যুৎ গতিতে আমার দুভাই গিয়ে সার্ভেন্ট কোয়ার্টার তল্লাশী করে দেখলেন আমাদের রান্নার বুয়া তার দূর সম্পর্কের এক কিশোরী আত্মীয়সহ সেখানে অবস্থান করছে। তারা তৎক্ষণাৎ বুয়াসহ সেই কিশোরীকে কোয়ার্টার ত্যাগের নির্দেশ দেন। বাড়ীর এক গেট দিয়ে ওরা বেরিয়ে যায় আর অন্য গেট দিয়ে প্রবেশ করলো পুলিশের গাড়ী। মহিলা পুলিশ আমাদের বাড়ীর অন্দর মহল

www.pathagar.com

তল্লাশী করলো আর পুরুষ পুলিশ সার্ভেন্ট কোয়ার্টার, তারা কিছুই পেল না। থাকলে তবে না পাবে। এ ঘটনা আইয়ুব খানের শাসন আমলে ঘটেছিল।

সেই হতাশার যুগে ইছরা থানার ওসির ভূমিকা, সাহস-হিম্মত ও মনোবল প্রশংসার দাবীদার। বড় অফিসার বা শাসকরা যাই করুক না কেন সে আব্বার ইজ্জতকে নিজের ইজ্জতের মতোই মূল্যবান মনে করেছিল সেই দিন। এ পবিত্র আত্মা পুলিশ অফিসার যদি নিজের ভবিষ্যৎ ও প্রমোশনের ঝুঁকি নিয়ে এগিয়ে না আসতেন তাহলে পরদিন সংবাদপত্রের পাতায় হেডলাইন হতো আমাদের সার্ভেন্ট কোয়ার্টার।

পুলিশের ওসি সেদিন আব্বাকে আরও বলেছিলেন, মাওলানা সাহেব আপনার কিছু ব্যক্তিগত স্টাফ প্রতিরাতে থানায় এসে দিনের রিপোর্ট দিয়ে যায়। আপনি ওদের যা বেতন দেন, ওরা থানা থেকে এর চেয়ে বেশী বেতন তোলে। এ ব্যক্তিগত স্টাফরাই সে রাতে আব্বা-আম্মার জন্য জান কুরবান করতে রাজি হবার দাবী করেছিল। এতসব তথ্য পাচার করার পরও আব্বা কোনো চাকর বা চাকরানীকে চাকরিচ্যুত করেননি। বরং আব্বা বলতেন, নতুন যাকেই রাখবো সেও এদের মতো থানায় ঠিকই রিপোর্ট দিবে।

* * *

www.pathagar.com

## কলেজ জীবনের কথা

দিন বদলের পালায় আমাদের স্কুল জীবন শেষ হলো। আমরা কলেজে ভর্তি হলাম। আইয়ুব খানের আমলে এমনিতেই আব্বার বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও প্রোপাগাণ্ডার ঝড় উঠেছিল। প্রতিদিন সংবাদপত্রের পাতা হেড়লাইনে মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে দু-একটি রিপোর্ট নিয়েই প্রকাশিত হতো। লাহোর মহিলা কলেজে পা দিতেই কোনো না কোনো দিক থেকে কানে ভেসে আসতো গালি–শ্লোগান! মরদূদী মরদূদী। এক মওদূদী একশ ইহুদী। এমনি নানা পদের গালিগালাজ। এসব শুনে আমরা খুব কষ্ট পেতাম। মনে ব্যাথা লাগতো। তবে, যখনই আমরা এসব কথা এসে আব্বাকে বলতাম, তখন তিনি এসব কষ্টদায়ক ঠাট্টা বিদ্রূপের জবাবে প্রায়ই বলতেন, একটি ফার্সী শ্লোক—

*দার কো এ নেক নামী মারা গুজার না দানদ,*
*গার তু নামি পছন্দই, তাগাইয়ুর কুনক্বা দা রা।*

অর্থ : ভালো কাজ করার জন্য (ওরা) পা রাখার জায়গা দিচ্ছে না।
এ যদি তোমার অপছন্দ হয়, তাহলে ভাগ্য মোদের বদলে দাও।

এ সকল পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে আম্মা আমাদের বলে দেন যে, যদি পড়ালেখা করে মানুষ হতে চাও তাহলে এসব লোকদের সাথে বসেই পড়তে হবে ; নইলে জাহেল থেকে যাবে। নিজেকে ধৈর্য-সবর ও সাহস-হিম্মতের অটল পাহাড় বানিয়ে নাও। বড় এবং প্রচণ্ড গতি সম্পন্ন ঝড়তুফান এসে পাহাড়কে আঘাত করে, পাহাড় কিন্তু তার নিজ স্থান ত্যাগ করে না। যেখানে ছিল সেখানেই অবিচল দাঁড়িয়ে থাকে। নিজের ভেতর সমুদ্রের ন্যায় বিশালতা তৈরী করো, দেখ বিশাল এক একটি নদী এসে সমুদ্রে পতিত হয়ে মিশে যায়। স্রোতস্বীনির নাম নিশানা থাকে না। সবাইকে সমুদ্র আত্মস্থ করে নেয়। কিন্তু সমুদ্র কখনই নিজের তটরেখা ছেড়ে অন্য কারো সীমানায় যায় না। বাজারের গালি হাসি-খুশী দিয়ে উড়িয়ে দিবে। আরও মনে রাখবে গালির জবাবে কখনই গালি দিবে না। আম্মার মূল বক্তব্য ছিল : চুপ থাকা হাজার জবাবের কাজ করে। নোংরা পানিতে ঢিল ফেললে নিজের কাপড় নোংরা হওয়ার আশঙ্কা বেশী। এ জন্যই কঠোর ভাষার গালি-ঠাট্টার জবাব দিয়ো না।

www.pathagar.com

ভাইবোনদের মধ্যে একমাত্র আমিই আব্বার কাছ থেকে সরাসরি পাঠ গ্রহণের সুযোগ পেয়েছিলাম। ম্যাট্রিকে আমার ফার্সী ছিল আর কলেজে উঠার পর আম্মার কথায় আমি আরবী নিলাম। কুরআন শরীফ তরজমাসহ পড়ার কারণে আরবী বুঝতাম। তবে ফার্স্ট ইয়ারে আব্বার কাছ থেকেই আরবীর মূল পাঠ গ্রহণ করি। আব্বা যখন দুপুর বেলা খাবার পর বিশ্রামে যেতেন তখন আমি খাতা কলম নিয়ে তার কাছে এসে বসতাম আর আরবী ভাষার শিক্ষা নিতাম। এভাবেই ইসলাম শিক্ষা বিষয়ে সূরা আহ্যাব -এর তরজমা এবং তাফসীর তার কাছ থেকেই শিক্ষা করেছি।

কলেজ জীবনের একটি মজার গল্প বলি। আব্বা চিন্তা-গবেষণার কাজে ব্যস্ত থাকতেন। এজন্য সময়ে সময়ে আমাদের ক্লাসের কথা বেমালুম ভুলে যেতেন। সেদিন আমার কলেজের ছুটির দিন ছিল। তাই স্বাভাবিক কারণে আমি বাসায় ছিলাম। হঠাৎ পাঠ কক্ষ থেকে আব্বা বাসায় দেখে বললেন, কি ব্যাপার! আজ তুমি স্কুলে যাওনি। আব্বার শান্ত প্রকৃতির প্রশ্নে আমি তো তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলাম। বললাম, আমরা এখন অনেক বড় হয়েছি। কলেজে পড়ি ; আপনি এখনও আমাদের স্কুলে পাঠাতে চান। আমি আমার মতো বলে যাচ্ছিলাম আর আব্বা মাথা ঝুঁকিয়ে শান্তভাবে বলছিলেন আচ্ছা! আচ্ছা! আচ্ছা ঠিক আছে।

* * *

www.pathagar.com

## লুকিয়ে লুকিয়ে পাণ্ডুলিপি পাঠ

দুপুরে কিংবা রাতের বেলা যখনই আব্বা খাবার জন্য অন্দরমহলে আসতেন তখন তিনি হঠাৎ চলে আসতেন। লিখতে লিখতে কলম-কাগজ, বই যেভাবে ছিল ঠিক সেভাবেই পড়ে থাকতো। আমি তখন স্কুল ছাত্রী। আমি তার দফতরে গিয়ে পাণ্ডুলিপি ওলট-পালট করে চুপিসারে পড়ে নিতাম। আমার খুব আগ্রহ ও কৌতূহল হতো, জানতে ইচ্ছে করতো তিনি আজকাল কি কি লিখছেন। মুখস্থ বিদ্যায় পারদর্শী হবার কারণে একটি লেখা দু-তিনবার পড়লেই মুখস্থ হয়ে যেত। আমার এ গোপন তৎপরতা কারোরই জানা ছিল না।

একদিন খাবার টেবিলের আলাপচারিতায় সুযোগ পেয়ে গেলাম। মানে আর চুপ থাকতে পারলাম না। আব্বার লেখা প্যারাগ্রাফ তারই ষ্টাইলে তাকে শুনিয়ে দিলাম। শুনে আব্বা তো অবাক ! বললেন, হায় হায় ! এটা তুমি জানলে কোত্থেকে ? আমি কাল রাতে এ বিষয়ে লিখেছি।

আব্বার বিস্ময়ের জবাবে আমি বললাম, আমি প্রতিদিন আপনার অফিস রুমে গিয়ে আপনার লেখাগুলো পড়ি। আমি সব জানি আপনি সম্প্রতি কি কি বিষয়ে কি লিখছেন। লুকিয়ে লুকিয়ে আমি সব পড়ে ফেলি। আব্বা বেশ পেরেশানীর সাথে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আচ্ছা! আচ্ছা! আমি জানতাম আব্বা ভেতরে ভেতরে বেশ আনন্দিত ছিলেন, যদিও বাহ্যিক আচরণে সেটা প্রকাশ করেননি।

এ ঘটনার কয়েকদিন পরের কথা। দাদী আব্বাকে ডেকে বললেন, উপর তলায় কি জ্বিন থাকে! আমার আব্বা জবাবে নিজ মাকে বললেন : আম্মাজী! আপনি তো একটি জ্বিনের কথা বলছেন, আমার জানামতে এখানে নয়টি জ্বিন আছে। আর এ জিন্নাতসমূহের মধ্যে এক প্রকার জ্বিন তো আমার কাগজ-কলমকে ছাড়ে না। আমার অবর্তমানে আমার লেখা পড়া হয় ও মুখস্থ করে নেয়া হয়। আর মুখস্থ করা আমার লেখা আমাকেই শুনানো হয় আমারই স্টাইলে। এ জ্বিন আমার কলমের দারোয়ান হয়ে বসে আছে। সামান্য একটু ভুল হলেই আর রক্ষা নেই।

কয়েক বছর পরের কথা। গ্রীষ্মের ছুটিতে আমি জেদ্দা থেকে বেড়াতে এসেছি পাকিস্তানে। আম্মা আমাকে একটি দারসে কুরআন দিতে পাঠিয়ে দিলেন লাহোরে। সেটাই ছিল আমার প্রথম দারস দান। পরে সেখান

www.pathagar.com

থেকে প্রশংসাসূচক টেলিফোন এলো আম্মার কাছে। এক ভদ্রমহিলা ফোন করে বললেন, বেগম সাহেবা! আপনার কন্যা দারুণ দারসে কুরআন পেশ করেছে। আমরা মনে করেছিলাম ইংরেজী সাহিত্যে এম. এ. পাস মেয়ে কি আর দারস দিবে, আপনি হয়তো শুধু প্রক্সি দেয়ার জন্যই তাকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু আমরা সত্যিই বিস্ময়াভিভূত। সত্যিই কুরআন-হাদীসের জ্ঞান আপনাদের পরিবারের উত্তরাধিকার।

এ ঘটনা যখন আব্বা জানতে পারলেন, তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা ঠিক করে বলতো দারস কিভাবে দিয়েছো ? আমি বললাম, আপনার লেখা যে প্যারাগ্রাফগুলো স্কুলে পড়া অবস্থায় মুখস্থ করেছিলাম, সেগুলো শুনিয়ে দিয়েছি। কিছু হাদীসের রেফারেন্স আর কালামে ইকবাল-এর সহযোগিতা নিয়েছি। কোথাও আটকে গেলে সেই মুখস্থ করা স্কুল জীবনের প্যারাগ্রাফ দিয়েই চালিয়ে দিয়েছি। আপনার যে লেখাগুলো মুখস্থ করেছি, সেগুলো বক্তৃতা দিতেও দারুণ কাজে আসে আর লেখার সময়তো কথাই নেই।

কথাগুলো আমি তোতা পাখির মতো বলেই যাচ্ছিলাম। এদিকে চেয়ে দেখি আমার প্রিয় আব্বা দুহাত দিয়ে নিজের মাথা চেপে ধরে হয়রান পেরেশান হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। পরে আমার ছোট বোন আসমা বলেছিলো আব্বার সাথে এভাবে কথা কেবল তুমিই বলতে পারো।

* * *

www.pathagar.com

## তাফসীর লিখতে লিখতে এই তো উঠে গেলেন .....

আমি "তাফহীমুল কুরআনের" অধ্যয়ন করেছি তখন, যখন সেই তাফসীর লেখা হচ্ছিল। এজন্য বিশ্বখ্যাত এ তাফসীর যখন পড়ি তখন আমার কাছে জাগ্রত ও জীবন্ত মনে হয়। তাই আজও তাফহীমের সেই অংশগুলো পড়ার সময় মনে মনে অনুভব করি তাফসীর লিখতে লিখতে এই তো কোনো জরুরী কাজে উঠে গেলেন তাফহীমুল কুরআনের রচয়িতা। কলম আর কাগজ অমনি পড়ে আছে টেবিলে, যেমন তখন পড়ে থাকতো। একটু পরে এসেই আবার কলম ধরবেন তিনি। যেন তিনি আজও এ দুনিয়াতে আছেন।

আব্বার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি নিজ সন্তানদের অত্যধিক সম্মান করতেন। যা কিনা কেউ পিতা-মাতার প্রতি প্রদর্শন করে থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় তিনি 'বেটী' বলে ডাকতেন। একটু অভিমান বা রাগ হলে বলতেন 'সাহেবজাদী' আর বেশী পরিমাণে নারাজ হলে বলতেন 'সাহেব জাদী সাহেবা।' আব্বার ডাকার এ পদ্ধতি আমাদের নিকট দারুণ লাগতো।

আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করতাম যেন আব্বা 'সাহেবজাদী সাহেবা' বলে সম্বোধন করার সুযোগই না পান। তথাপি বলতে হয় তিনি রাগ হতেন না। যেন তার প্রকৃতির মধ্যেই রাগভাব ছিল না।

* * *

www.pathagar.com

## নাতনীর সাথে কথোপকথন

আমার কন্যা রাবেয়াকে (জন্ম : ২১ জানুয়ারী ১৯৬৭) আব্বা দারুণ স্নেহ করতেন। ১৯৭০ সালের একটি ঘটনা। সেদিন আমরা ওকে নিয়ে লাহোরের আনারকলি বাজারে গিয়েছিলাম কিছু কেনাকাটার জন্য। সে সময়ই পিপলস পার্টির একটি মিছিল সে এলাকা অতিক্রম করছিল। সে মিছিলকারীরা আব্বাকে নানা ভাষায় গালি দিচ্ছিল। এ দৃশ্য দেখে কেনাকাটা না করেই আমরা ঘরে ফিরে আসি। দুপুরে যখন আব্বা মধ্যাহ্নভোজের জন্য ঘরে আসেন তখন আমার মেয়ে রাবেয়া খাবার টেবিলে একেবারে তার চেয়ারের নিকটবর্তী চেয়ারে গিয়ে বসে। এরপর আব্বার চেহারা গভীরভাবে পরখ করে আমার মেয়ে প্রশ্ন করলো, নানা জান; আপনিই কি মাওলানা মওদূদী ? আব্বা বললেন, হ্যাঁ বেটী, আমি।

রাবেয়া বলল : আনারকলি বাজারে মাওলানা মওদূদীকে কিছু লোক গালি দিচ্ছিল।

নাতনীর একথা শুনে আব্বা খুশীতে যেন বাগ বাগ হয়ে মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি শুনেছেন তাহলে। এতে আমি ধমক দিয়ে রাবেয়াকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "খুশীতে আপনার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে কেউ গালি দেয়নি বরং আপনাকে লাখ টাকার সম্পদ এনে দিয়েছে।"

আমার কথা শুনে আব্বা হতচকিত হয়ে গম্ভীরভাবে বললেন, বেটী, আমি তো আল্লাহর রাহে কেবল গালি খেয়েছি। পয়গাম্বর ও আল্লাহর নেক বান্দারা তো প্রস্তরাঘাতে জর্জরিত হয়েছেন, এতো আল্লাহর রাহে পথচলার গালি, এ তো আম্বিয়ায়েকেরামের সুন্নত। এ কি সবার ভাগ্যে জোটে মা !

একদিন এক ভদ্রলোক আমাদের বাসায় তশরীফ আনলেন। তিনি আব্বাকে একটি মূল্যবান বিদেশী কলম উপহার দিয়ে বললেন : এটা একটি তোহফা, যা একজন রুশ ব্যক্তি আপনার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করবেন। পরবর্তিতে জানা যায় ভদ্র লোক কয়েক মাস পূর্বে তাসখন্দে গিয়েছিলেন। যেখানে গণ্যমান্য রুশ নাগরিক গোপনে ডেকে তাকে বললেন, আমি একজন মুসলমান অনুগ্রহ করে এ কলমটি পাকিস্তানে ফিরে গিয়ে মাওলানা মওদূদীর হাতে তুলে দিবেন।

www.pathagar.com

# আমার অনুপম আদর্শ

১৯৬৮ সালে ভূট্টো সাহেব (মৃত্যু ঃ এপ্রিল ১৯৭৯) ছাত্র সমাজের একাশংকে ক্ষমতায় আরোহণের সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহারে জন্য নোংরা রাজ নীতির খেলায় নামিয়ে দেন। শ্রমিকদের মিল ফ্যাক্টরী থেকে বের করে রাজ -পথের রাজনীতি শিখিয়ে দেন। এসব রাজনীতিতে আব্বা দুঃখভারাক্রান্ত হয়ে বলেছিলেন : একবার ছাত্র সমাজকে ক্লাস থেকে বের করে রাস্তায় নামিয়ে বিক্ষোভ করানো আন্দোলন জমানো আর মিছিল-মিটিং সহজ। কিন্তু পরবর্তীতে আপনি যদি চান এই বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা আবার সুবোধ বালকের মতো ক্লাসে এসে বসে পড়বে,আবার পড়াশুনার মতো হয়ে পড়বে এটা অসম্ভব ভাবনা। এ জ্বিনকে বোতলের মধ্যেই থাকতে দিন। এ জ্বিন একবার বোতলের ভিতরে থেকে বেরিয়ে আসলে আবার তাকে বোতলে ভরে ছিপি আটা অসম্ভব কাজগুলোর মধ্যে একটি।

শ্রমিকদের বিষয়টি তেমনি। একবার ওদেরকে মিল-ফ্যাক্টরী থেকে বের করে এনে আন্দোলন বিক্ষোভ করানো সহজ কিন্তু কাল আবার ওদের দিয়ে ফ্যাক্টরীতে নিষ্ঠার সাথে কাজ করাতে চাইবেন। তখন আর তা পারবেন না। আব্বা তখন আবেদন করেছিলেন এ জাতিকে যে, এতে শিক্ষা, শিল্প ও পেশাজীবি মহলের মৃত্যু ঘন্টা বাজবে। কিন্তু তখন থেকেই জাতীয় জীবনে বিশংখল রাজনীতির যে ঘন্টা বেজে উঠেছিল তার জের আজতক চলছে।'

আব্বাজান ছিলেন এক পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। তিনি এতো অধিক পরিমাণে গবেষণাধর্মী কাজ করে গেছেন যা অন্যদের কাছে দুর্বহ ও নীরস মনে হতো। কিন্তু তিনি নিজ জীবনের লাইফ স্টাইলে দারুণ প্রাণবন্ত ব্যক্তিত্বের অধিকারী এক মানুষ ছিলেন। এ সকল বিবেচনায় আমার আইডিয়েল আমার আদর্শ—আমার আব্বা। আমার বাসায় আব্বাকে সুখে-দুঃখে উভয় অবস্থাতেই দেখেছি। কারণ, সুখে-দুঃখে বাবাই ছিলেন আমাদের জীবন সাথী। তিনি রক্তে মাংসে গড়া মানুষ ছিলেন—যখন আব্বার উপর দুঃখ বেদনা ও শোক এমনভাবে ছায়া বিস্তার করলো যে, তিনি শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। এ দুঃখ তার চেহারা মুবারকে বেদনাহত করে দেয়। ঘটনাসমূহ হলো—

www.pathagar.com

এক : আগস্ট ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর সহায় সম্বলহীন মুসলিম মা–বোনোরা ইজ্জত নিয়ে প্রাণভয়ে পলায়নপর অবস্থায় যে ভাবে লুণ্ঠিত হয়ে ছিলেন তার বর্ণনা শুনে।

দ্বিতীয় ঘটনা : ১৯৬৬ সালের ২৫ আগস্ট যখন মিসরের স্বৈরশাসক জামাল আবদুন নাসের (মৃত্যু ঃ সেপ্টেম্বর ১৯৭০) ফী যিলা লিল। কুরআনের লেখক সাইয়েদ কুতুব (রহ.)-কে ফাঁসীতে ঝুলিয়ে শহীদ করেন।

তৃতীয় ঘটনা : ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর যখন যুক্ত পাকিস্তান হতে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। এ ঘটনার পর আব্বার মনের অবস্থা যে কি হয়েছিল। তা কিভাবে বর্ণনা করবো এখানে ? শুধু এতটুকু বলি হয়তো পাঠক বুঝে নেবেন। এ ঘটনার কয়েকদিনের মাথায় তার প্রথম হার্ট এ্যাটাক হয়। আব্বাজান আমাদের বলতেন ঃ ঢাকার পতন শুধু একটি দেশের পতন নয় বরং একটি উম্মাহ ও একটি আদর্শের পতন। পূর্ব পাকিস্তান কোনো দিন নিজ থেকে আলাদা হতো না। বরং বিষয়টি এভাবে বুঝে নিও যে পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন শাসক গোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানকে দুঃখ-বেদনা-যন্ত্রণা দিতে দিতে আলাদা করে দিয়েছে।

* * *

www.pathagar.com

## জুন ১৯৭২ : তাফহীমুল কুরআনের প্রকাশনা উৎসবে....

১৯৭২ সালের ৭ জুন তাফহীমুল কুরআনের ৬ষ্ঠ অর্থাৎ সর্বশেষ জিলদ প্রকাশিত হয়। তাফহীমুল কুরআনের প্রকাশনা পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে জুন মাসের শেষ দিকে লাহোরের ফ্লাটার্স হোটেলে একটি অনুষ্ঠান হয়। এ অনুষ্ঠানে অনেকেই অংশ নেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দেশখ্যাত আইনজ্ঞ এ.কে. ব্রোহী (মৃত্যু : ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭) সেদিন বলেছিলেন, মাওলানা মওদূদীর তাফহীমুল কুরআন কোটি কোটি ইংরেজী শিক্ষায় দীক্ষিত যুবকদের ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করেছে এবং তাদের জীবনে এনেছে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন।

এ কে ব্রোহী সাহেব সেদিন আরও বলেন, "মানুষের সর্বাধিক মূল্যবান বস্তু তার সীরাত বা চরিত্র। যদি কারও চরিত্র বদলানো যায় অসৎ চরিত্রের মানুষকে সৎ বানানো যায়, তাহলে যে লোক এ কাজ করে অর্থাৎ মানুষ গড়ার কারিগরী যে করে সেই হয় তাদের হৃদয়ের স্পন্দন, জীবনের আইডিয়াল। আমার দৃষ্টিতে আজ পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় ও মহান ব্যক্তিত্ব মাওলানা মওদূদী। আজ যদি প্রশ্ন করা হয় কোনো ব্যক্তির সাহিত্য কর্ম সমগ্র পাকিস্তানবাসীর চরিত্র গঠনে সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তারকারী হিসেবে কাজ করেছে ? তাহলে এর উত্তরে আমি বলবো, তিনি হলেন মাওলানা মওদূদী। রোজ কেয়ামতে যদি এ সাক্ষ্য চাওয়া হয় তাহলে আমি আল্লাহ তা'আলার সামনে এই সাক্ষ্যই দিব, যা আজ দিচ্ছি।

যখন আব্বার বক্তব্য দেবার পালা আসলো তখন তিনি বললেন, যদি দুনিয়াতে কোনো কাজ বা অবদান সর্বসম্মতিক্রমেও স্বীকৃতি লাভ করে আর বারগাহে এলাহীতে কবুল না হয় তাহলে কিছুই অর্জিত হলো না। অপরপক্ষে কোনো কাজ যদি দুনিয়াবাসীর কাছে গৃহীত না হয় অথচ আল্লাহ সেটা কবুল করে নেন তাহলে সেটাই আসল কমিয়াবী। আমি দোয়া করছি আর আপনারাও আমার সাথে দোয়া করুন যেন আল্লাহ পাক এ সামান্য খেদমত কবুল করেন। আর এ কিতাব যদি একজন মানুষেরও হেদায়েত লাভের কারণ হয় তাহলে তা যেন আমার মাগফিরাতের উসিলা হয়।

তিনি আরও দোয়া করলেন, "বান্দা নিজ রবের খেদমতে কয়েকটি কাগজ নিয়ে নিতান্ত অসহায়ভাবে দণ্ডায়মান। এ তাফসীর তাফহীমে হকের জন্য আর এ জীবন শাহাদাতে হক বিনা অন্য কিছুর জন্য ওয়াকফকৃত নয়।

www.pathagar.com

আর তিনিই তো সেই আল্লাহ যিনি তার বান্দাদের এসব কাজ করার তৌফিক দেন।"

আব্বা তাযকিয়ায়ে নফস, শাহাদাতে হক আর ইক্বামাতে দ্বীনের যুগপৎ সংগ্রামের জন্য চতুমুর্খী লড়াই করে গেছেন। তার এ লড়াইয়ের প্রতিপক্ষ ছিল:

প্রথমত ঃ ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী, যারা সমস্ত প্রশাসন যন্ত্রকে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবহার করে গেছে।

দ্বিতীয়ত ঃ পুঁজিপতি ও সামন্ত প্রভুরা নিজেদের অর্থ-সম্পদ, বিত্ত-বৈভব ও প্রভাব-প্রতিপত্তি নিয়ে প্রবলভাবে বিরোধিতা করেছে।

তৃতীয়ত ঃ কমিউনিজমের উত্থান পর্বের কারণে সোশালিস্ট ও কমিউনিস্টদের অসভ্য-অশালীন প্রোপাগাণ্ডা তাকে ঘায়েল করার চেষ্টা করে গেছে অবিরত।

চতুর্থত ঃ ধর্মীয় নেতার লেবাস পরা ধর্মব্যবসায়ী আলেম পীর মাশায়েখ গোষ্ঠী।

পঞ্চমত ঃ কাদিয়ানী গোষ্ঠী যারা বিরোধিতা করতে গিয়ে অত্যন্ত নীচ ও হীনমন্য আচরণ করেছিল।

ষষ্ঠত ঃ শিরককারীদের দল ও তাদের জাত ভাই হাদীস অস্বীকারকারীদের একটি বিরাট দল।

এভাবেই নানা ফ্রন্টে চলেছিল এ চর্তুমুখী লড়াই। নিতান্ত দুর্বল স্বাস্থ্য ও অবিরাম অসুস্থতার মাঝেও আব্বা একাই চালিয়েছেন এ লড়াই।

তিনি একাধারে একজন আধুনিক আলেমে দ্বীন হবার সাথে সাথে একজন রিসার্চ স্কলার, মুফাস্সিরে কুরআন ও ইসলামী চিন্তাবিদ, দা'য়ী ইলাল্লাহ্, সাংবাদিক ও সুসাহিত্যিক ছিলেন এবং সর্বোপরি তিনি একজন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন রাজনীতিবিদও ছিলেন।

* * *

www.pathagar.com

# এপ্রিল ১৯৭৭ সাল :
# দেখা করতে আসলেন প্রধানমন্ত্রী ভূট্টো

১৯৭৭ সালে পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দল পাকিস্তান পিপলস পার্টির (পিপিপি) ব্যাপক কারচুপির কারণে দেশ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। পাকিস্তান কওমী ইতে ত্তহাদ নামক সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ সমগ্র পাকিস্তানব্যাপী সরকার পতন আন্দোলন শুরু করে। ২ এপ্রিল আব্বা প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভূট্টোর উদ্দেশ্যে প্রস্তাব দেন ভূট্টো সাহেব, আপনি এ নির্বাচন বাতিল করে পুনঃনির্বাচন দিন এবং নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করার ব্যবস্থা নিন। কিন্তু ভূট্টো সাহেব ক্ষমতার মসনদে বসে অন্ধের মতো আচরণ করলেন। বিক্ষুব্ধ জনতাকে নিবৃত্ত করতে গুলিবর্ষণের নির্দেশ দিলেন, যার পরিণতি হয়েছিল ভয়াবহ।

শেষের দিকে একবার তিনি আব্বার সাথে দেখা করতে ইছরার ৫–এ যায়িলদার পার্কে অবস্থিত আমাদের বাসায় আসলেন, সেটা সম্ভবত মাঝ এপ্রিলের ঘটনা হবে। ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রীর আসার কথা রটে গেলে মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো এবং ভূট্টো বিরোধী শ্লোগান দিতে থাকলো। আব্বাজান এলাকার মানুষকে সবিনয়ে অনুরোধ করে বললেন, আজ ভূট্টো সাহেব আমার মেহমান। তাকে সম্মান প্রদর্শন করার অর্থ হবে আমাকেই সম্মান প্রদর্শন করা। আজ এ মহল্লায় তার ইজ্জত মানে আমার ইজ্জত। এতে লোকজন কিছুটা নিবৃত্ত হলো।

প্রায় ৪৫ মিনিট স্থায়ী এ আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভূট্টো শুরুতেই বললেন, "আমি আপনাকে বিশ্বাস করি এবং আপনার উপর পরিপূর্ণ আস্থা রাখি। আমি আজ একটি সাদা কাগজে সই করে দিতে পারি, যেকোনো শর্ত আপনি আরোপ করুন আমি মেনে নিব।"

আব্বা এসব কথার জবাবে বললেন, আপনি এখন পদত্যাগ পত্রে সই করে দিন। কারণ পরিস্থিতি বর্তমানে এতো নাজুক আকার ধারণ করেছে যে, পদত্যাগ ছাড়া জনগণ অন্য কিছু মানবে না। এরপর অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে আবার ক্ষমতায় আসুন কোনো অসুবিধা নেই ; কিন্তু বর্তমানে পদত্যাগ ছাড়া আমি কোনো সমাধান দেখছি না।

এ নাতিদীর্ঘ মোলাকাতে বেশীরভাগ সময় ভূট্টো সাহেবই কথা বলে যাচ্ছিলেন। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরে তিনি আরো বললেন,

www.pathagar.com

আফগানিস্তানের অবস্থা এরূপ, ভারতে এটা ওটা হচ্ছে, বেলুচিস্তানের অবস্থাও ভাল নয়, ইরানের অবস্থা আরও খারাপ হতে পারে, এ পরিস্থিতিতে আমাকে জাতির খুব বেশী প্রয়োজন।

এসব ব্যাখ্যা করে প্রধানমন্ত্রী ভূট্টো সাহেব আবার প্রশ্ন করলেন, এবার আপনি বলুন, আমি কি করতে পারি ?

আব্বার সাফ সাফ জবাব, এসকল পরিস্থিতির দাবীও এটাই যে, আপনি পদত্যাগ করে ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ান। এরপর সুষ্ঠু, অবাধ, নিরপেক্ষ ও সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি নির্বাচনের ব্যবস্থা করুন। জনগণ যদি রায় দেয় তাহলে আবার সরকার গঠন করে দেশ চালান। পদত্যাগ করে গণরায়ের ভিত্তিতে ক্ষমতায় আসলে আপনার সরকারের নৈতিক শক্তি বাড়বে এবং দেশ ও জাতির জন্যও কল্যাণকর হবে। আপনার বিবৃত অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহ মোকাবিলা করার জন্য এটাই একমাত্র পন্থা হতে পারে। কিন্তু ভূট্টো সাহেব পদত্যাগের ধারে কাছেও আসতে রাজী হলেন না।

এরপর তিনি দেশ ও জাতির প্রতি তার বিভিন্ন অবদানের ফিরিস্তি গাইতে শুরু করলেন। আব্বা এর জবাবে বললেন, আপনার অবদানসমূহ অস্বীকার করা হচ্ছে না, বরং যে কাজ ভুল তার স্বীকৃতি লাভের জন্য নিজস্ব অবদান বর্ণনা অর্থহীন। আমি চাই না দেশ আবার একটি মহা-বিপর্যয়ে নিপতিত হোক, তাই আপনার সাথে মোলাকাতে একথাগুলো বলে ফেললাম। আমি আশংকা করছি, যে জনতা আজ রাজপথে আপনার পদত্যাগ দাবী করছে আগামী দিনে তারা এর চেয়ে বেশী কিছু দাবী না করে বসে। আর এ সংকট বাড়তে থাকলে সামরিক শাসন জারীর আশংকা উড়িয়ে দেয়া যায় না। আর দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো সামরিক শাসন খোদ দেশ ও জাতির জন্য মহাবিপর্যয়ের প্রথম সোপান।

এ বৈঠকের কিছুক্ষণ পরেই আব্বা একটি সংবাদ সম্মেলন আহ্বান করেন এবং সেখানে সাংবাদিকদের বৈঠকের বিষয়বস্তু সবিস্তারে বর্ণনা করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ বৈঠকের মাত্র সাতদিন পরেই জনাব ভূট্টো সাহেব করাচী ও হায়দ্রাবাদে সামরিক আইন জারী করে সেনা শাসনের পথ আরও প্রশস্ত করে দেন। এর অল্পদিন পরেই পাকিস্তানে নেমে আসে জিয়াউল হকের সামরিক শাসন।

* * *

www.pathagar.com

# রাজা বাদশাহদের সাথে সম্পর্ক

আব্বাজানের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল তিনি কখনই বড় লোকদের নিকট কোনো অবস্থাতেই নত হতেন না, আর আমাদের উপদেশ দিয়ে বলতেন, "মানুষকে মানুষ হিসেবেই দেখা উচিত, অন্য কিছু নয়। মানুষের ঘর-বাড়ী, গাড়ী-ঘোড়া লটবহর কিংবা তার পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে তার বড় বা ছোট হবার ফায়সালা করা অনুচিত। এই যে বড় বড় প্রাসাদোপম বাড়ী দেখো, এগুলোর অধিকাংশই প্রাণহীন গোরস্থান। প্রাসাদবাসীর চরিত্র মহান হতে হবে এমন কোনো কার্যকারণ নেই।"

একবার সৌদি আরবের বাদশাহ ফয়সাল বিন আবদুল আযিয আল-সউদ আব্বাজানকে সৌদি আরবের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে তার উপদেষ্টা হবার অনুরোধ করেছিলেন। আব্বা সৌদি আরবের বাদশাহর প্রস্তাব নাকচ করে বলেছিলেন, আমি আমার বর্তমান অবস্থানে থেকে আপনার সার্বক্ষণিক উপদেষ্টা। আপনার যখনই প্রয়োজন রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে অথবা সরাসরি আমার পরামর্শ নিতে পারবেন। যে পরামর্শ সত্য সঠিক তাই দিব। তবে নাগরিকত্ব কবুল করে উপদেষ্টার চাকুরী গ্রহণ করলে হয়তো বা সঠিক পরামর্শ নাও দিতে পারি।

১৯৭৪ সালের গ্রীষ্মকালে এক বিকেলের কথা। জর্দানের বাদশাহ হোসেন বিন তালাল (মৃত্যু : ২০০০ সাল) হঠাৎ আব্বার কাছে ফোনে বেশ কিছুক্ষণ কথা বললেন। আমরা প্রচণ্ড আগ্রহ ভরে জানতে চাইলাম বাদশাহ হোসেন আপনার সাথে কি আলাপ করেছেন ? আব্বা অত্যন্ত অনাগ্রহের সাথে বললেন, এ ধরনের শাসকরা এমন কিছু নয় যে তাদের খুব বেশী গুরুত্ব দেয়া উচিত। এরা অনেক বড় বড় কথা বলে তবে তাও তাদের স্বার্থকেন্দ্রিক। কোনো কারণে তাদের স্বার্থ কিংবা তাদের সন্তান-সন্ততির স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হলে তারা সুযোগ বুঝে কেটে পড়ে।

তিনি আরো বলেন, 'আসল দামী লোক তারাই যারা দীনের ওয়াফাদার এবং দীনের জন্য সকল প্রকার কুরবানী দিতে প্রস্তুত। যারা সামনা-সামনি সমালোচনা করতেও দ্বিধান্বিত হয় না, আবার কাঁধে-কাঁধ মিলিয়েও সীসাঢালা প্রাচীরের মতো প্রতিরক্ষা ব্যূহ হয়ে দাঁড়িয়ে যায়।

আমি তখন সৌদী কলেজ ফর উইমেন্স রিয়াদে চাকুরীরত। একদিন এক সৌদী লেকচারার আমাকে বললেন : 'আমি সৌদি নাগরিক। বিদেশ থেকে আগত আজনবীরা পরদেশী আমার মোকাবিলা করতে পারবে না।

www.pathagar.com

আমি সেই স্টাফ মিটিং-এর মধ্যেই সেই সৌদী মহিলা লেকচারের উদ্দেশ্যে বললাম, আপনাদের বাদশাহ ফয়সাল আমার আব্বাকে বাদশাহের উপদেষ্টা হবার প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং সৌদি আরবের নাগরিকত্ব গ্রহণের অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু আমার আববা বাদশাহর সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। আমি সেদিন সেই সৌদি মহিলাকে বুঝাতে সক্ষম হয়েছিলাম যে, আমি সেই পিতার কন্যা যার বড় পদ গ্রহণের কোনো লোভ নেই। এ ঘটনা যখন ঘটে তখন শাহ ফয়সাল সৌদী আরবের বাদশাহ।

ইখওয়ানুল মুসলেমিন-এর দ্বিতীয় মুর্শিদে আম শাইখ হাসান আল হোযাইবীর কন্যা সে সময় ছিলেন আমার সহকর্মী। তিনি উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্বে ছিলেন। মিটিং শেষে তিনি বিশেষভাবে আমার সাথে সাক্ষাত করতে আসেন এবং বলেন, তুমি আসলেই এক মহান পিতার কন্যা। তিনি আমাকে হযরত আলী রা.-এর একটি স্মরণীয় বাণী শোনালেন। সেটা হলো—"দুনিয়ার অবস্থা হলো এই যে, তুমি একে লাথি মেরে দূরে ফেলে দিলে সে তোমার পায়ের কাছে এসে পড়বে।" এ ঘটনার পর সৌদী আরবে থাকাকালীন আর কোনো দিন অসৌদী হবার খোটা শুনতে হয়নি।

* * *

www.pathagar.com

## বাদশাহ্ ফয়সালকে একটি পরামর্শ

সৌদি আরবর বাদশাহ্ ফয়সাল বিন আবদুল আযিযকে আব্বা আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দেন। আমি মাঝে মধ্যে চিন্তা করি শাহ্ ফয়সাল যদি সেদিন আব্বার পরামর্শ গ্রহণ করে কার্যকর করতেন তাহলে আজ মুসলিম বিশ্বের চেহারাই হতো অন্যরকম। আমরা এক অন্যরকম সৌদি আরব দেখতাম।

আব্বা একবার শাহ্ ফয়সালের সাথে আলাপ আলোচনার সময় পরামর্শ দিয়ে বলেছিলেন, যেভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ডলারের জোরে সমগ্র পৃথিবীর উন্নত মেধাকে কিনে নিয়েছে। এবং এ মেধাবী জনবলই মাত্র পাঁচশত বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত একটি রাষ্ট্রকে অসামান্য উন্নতি এনে দিয়েছে। তার অনুকরণে আপনি আধুনিক সৌদি আরব গড়ে তুলুন। আপনি যুক্তরাষ্ট্রের মতো রিয়াল এবং পেট্রোলের জোরে সমগ্র মুসলিম বিশ্বের উন্নত মেধাসমূহকে সৌদী আরবে কেন্দ্রীভূত করে ফেলুন। কারণ রিয়াল, পেট্রোল এবং ভূমি কোনো কিছুর অভাব নেই আপনার কিন্তু শর্ত হলো এমন উন্নত মেধাবী বিশেষজ্ঞ ডাক্তার, প্রকৌশলী, বিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ এবং রিসার্চ স্কলারদের আপনি সৌদি আরবের নাগরিকত্ব সমেত সকল প্রকার মৌলিক অধিকার প্রদান করবেন। এটা করতে পারলে আপনি দেখবেন মুসলিম বিশ্বের এ সূর্য সন্তানরা সৌদি আরবকে শিক্ষা, বিজ্ঞান, শিল্প, অর্থনীতি, সমাজ-সভ্যতা, প্রতিরক্ষা এবং প্রযুক্তি বিদ্যায় অসামান্য উন্নতি এনে দিবে। তখন এ উন্নতি এবং এ সম্মান শুধুমাত্র সৌদি আরবে উন্নতি হবে না বরং তা সমগ্র মুসলিম দুনিয়াকে উন্নতি সম্মান এবং সৌভাগ্যের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। জবাবে সেদিন শাহ ফয়সাল বলেছিলেন, আমি রিয়ালের জোরে সমগ্র মুসলিম দুনিয়ার মেধাকে সৌদি আরবে একত্রিত করে তাদের নাগরিকত্ব সমেত সকল মৌলিক অধিকার দিয়ে দিব। অন্যদিকে দেখবো যে আমার স্বদেশী আরবের বেদুইনরা ছাগল ও মেষপাল নিয়ে উটের উপর বসে আবার সেই তাঁবুতে ফিরে যাচ্ছে। এবং তারা মরু ভূমির বিরূপ প্রান্তরে এমনভাবে হারিয়ে যাবে যে তাদের নাম নিশানা পর্যন্ত কোনোদিন খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আফসোস ! শাহ্ ফয়সাল এবং তাঁর পরবর্তী আরব শাসকদের কেউই বিষয়টি অনুধাবন করে দুরদর্শিতার পরিচয় দিতে পারলেন না। ফলে আজ তেল এবং রিয়ালের জোরে বিলাস বহুল নামী দামী গাড়ী, সুরম্য

www.pathagar.com

প্রাসাদ এক পশ্চিমা ব্যাংকসমূহে বিশাল আমানত ছাড়া আরবদের গর্ব করার মতো কি আছে। তাদের প্রতিরক্ষার জামিনদার যুক্তরাষ্ট্র এবং অর্থনীতির বাগডোর পশ্চিমা অর্থনীতিবিদদের হাতের মুঠোয়। বেদুইনরা দামী মার্কিন গাড়ী চালাচ্ছে। দুঃখের বিষয় আমাদের সমসাময়িক মুসলিম শাসকদের অপরিনাম দর্শিতা, হীনমন্যতা এবং অদূরদর্শিতার কারণেই এসব হয়েছে, হচ্ছে। তারা কেবল নিজেদের উন্নতি প্রগতি ছাড়া অন্য কারও উন্নতি বরদাশত করতে পারেন না। বরং নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে দেখতে পারেন না।

আব্বা প্রায়ই বলতেন, যতদিন পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহ সাহাবায়ে কেরাম রা.-এর মতো গুণাবলী অর্জন না করবে, ততদিন পর্যন্ত আল্লাহর দীন জয়লাভ করবে না। যে গুণাবলীর কথা আল্লাহ পাক কুরআন পাকে নিম্নোক্ত ভাষায় বলেছেন—

اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ز سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ط ذَالِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ ط وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ ج

অর্থ : "তারা কাফেরদের প্রতি শক্ত কঠোর এবং পরস্পর পূর্ণ দয়াশীল। তোমরা তাদের রুকূ', সিজদায় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তোষের সন্ধানে আত্মনিমগ্ন দেখতে পাবে। সিজদাসমূহের চিহ্ন তাদের মুখাবয়বে ভাস্বর হয়ে আছে যা তাদের স্বাতন্ত্র সহকারে পরিচিত করাবে। তাদের এ গুণ ও পরিচিতি তাওরাত আর ইঞ্জিলে উল্লেখিত।"–সূরা আল্ ফাতহ : ২৯

কমবেশী আজ সমগ্র মুসলিম বিশ্বের শাসকবৃন্দের অবস্থা এই যে, কাফের মুশরিক নেতৃত্বের সামনে অসংকোচে বিনা শর্তে তারা নত মস্তক হয়ে যান আর তাদের সেবা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। অথচ নিজেরা ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে পারেন না।

আব্বাজান এক জায়গায় লিখেছেন : "আল্লাহর দীন সিংহ শাবকের ন্যায় বাহাদুর মানুষের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। যারা বাতাসের গতি পাল্টে দেবার হিম্মত বুকে ধারণ করে। যারা আল্লাহর রঙে দুনিয়াবী সকল রঙের উপর প্রাধান্য দেয়, ভালোবাসে। দুনিয়াটা আল্লাহর রঙে রাঙাতে চায়। নদীর চলমান স্রোতধারায় নিজেকে ভাসিয়ে দেয়ার জন্য মুসলমানকে

www.pathagar.com

সৃষ্টি করা হয়নি। বরং জীবনের চলমান স্রোতধারাসমূহের দিক পরিবর্তন করে সিরাতুল মুস্তাকিমের দিকে ঘুরিয়ে দেয়ার হিম্মত যার আছে, তিনিই মুসলমান।"

একবার আমি আব্বার কাছে অভিযোগ করেছিলাম যে, সৌদী আরবে ইংরেজী সিলেবাসের গল্পগুলো নেহায়েত অর্থহীন ও অশ্লীল। মিসরী ও পাকিস্তানী শিক্ষকমণ্ডলী এর উপর নানা রংবেরঙ্গের প্রলেপ দিয়ে তাকে আরও অশ্লীল বানিয়ে ফেলেছে। এসব শুনে আব্বা ওস্তাদদের স্থানকে বিশেষ করে আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত একজন শিক্ষকের দায়িত্ব উল্লেখ করে আমাকে উপদেশ স্বরূপ বলেন, একটি সিলেবাস বুকলিস্টে থাকে আর একটি থাকে শিক্ষকের মগজে। আসল গুরুত্বপূর্ণ সিলেবাস তো সেটি যা শিক্ষকের মগজ-মস্তিষ্কে অবস্থান করে। ইসলামী আদর্শের অনুসারী একজন শিক্ষক তো 'গীতা' থেকেও আল্ কুরআন পড়াতে পারেন। এরপর তিনি আরও বললেন, নিকৃষ্টতর সিলেবাসও যদি সঠিক আদর্শিক দৃষ্টিকোণ নিয়ে পড়ানো হয় তাহলে সেটাও শিক্ষার্থীদের চরিত্র গঠনে ভূমিকা রাখতে পারে।

* * *

www.pathagar.com

# একটি স্বপ্নের তা'বীর

১৯৭৮ সালের গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে আমি তখন লাহোরে। একদিন সন্ধ্যা বেলার কথা। পাকিস্তান এয়ারফোর্সের দুজন স্কোয়ার্ডন লিডার আব্বার সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে 'সারগোদা' এয়ার বেস থেকে লাহোরে আসেন। আব্বা তখন নিজ অফিসে বসে কাজ করছিলেন।

এদের মধ্যে একজনকে দেখতে বেশ অস্থির ও উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল। অস্থিরতায় ব্যাকুল অফিসার কথা শুরু করলেন এভাবে : মাওলানা ! আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি এবং যেদিন দেখেছি সেদিন থেকে আমি বড় অস্থির ও বিহ্বলতার মধ্যে আছি। চিন্তায় আমার ঘুম আসে না, খেতে ইচ্ছা করে না। অর্থাৎ তখন থেকে কোনো কাজই মন দিয়ে করতে পারছি না। স্বপ্নটি ছিল এরূপ : আমি মদীনাতে গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখি সমগ্র মদীনা বোমার আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত, সম্পূর্ণ শহর বিধ্বস্ত। মসজিদ নেই, মিনার নেই, নেই কিছুই। এ অবস্থায় আমি যখন রওজা মোবারকের কাছে যাই সেখানে দেখতে পেলাম রাসূলুল্লাহ সা. কবরের বাইরে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছেন। এরই মধ্যে আমার কানে কিছু মানুষের শোরগোলের শব্দ ভেসে আসলো। এদিক সেদিক তাকিয়ে কিছুই দেখলাম না। হঠাৎ একটি সুড়ঙ্গ নজরে এলো এবং ভিতরে যাবার সিঁড়ি দেখতে পেলাম। সিঁড়ি দিয়ে নিচের দিকে নামতে থাকলাম। অর্ধেক পথ এসে দেখি ৬/৭ জন ইহুদী, হাতে বড় বড় ছোরা এবং তারা সবাই অন্তবাস পরিহিত। মানুষের লাশ টুকরো টুকরো করে কেটে স্তুপ করছে আর দেয়ালে অনেকগুলো লাশ লটকানো। এ বীভৎস দৃশ্য দেখে আমি দৌড়ে উপরে চলে আসলাম। উপরে উঠে দেখি রাসূলুল্লাহ সা. বৈঠকে বসে সালাম ফিরালেন : এরপর হুজুর পাক সা. আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ভয় পেয়ো না, চিন্তা করো না। এ গোশত বিক্রি হবে এবং এর সাথে সাথেই আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। এখানেই শেষ। মাওলানা সেদিন থেকে দিন দিন আমার অস্থিরতা বেড়েই চলেছে। এবার আপনি একটু বুঝিয়ে বলুন : এই স্বপ্নের তাবীর কি ?

আব্বা স্বপ্ন জগতের অধিবাসী ছিলেন না। তিনি স্বপ্নের তা'বীরের মাধ্যমে ফলাফল নির্ধারণের পক্ষপাতিও ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন বাস্তববাদী দা'য়ী ইলাল্লাহ। তথাপি স্বপ্নের বর্ণনা শুনে আব্বা বিস্ময়ে হতবাক ও বিমূঢ় হয়ে যাচ্ছিলেন এই চিন্তা করে এ ধরনের স্বপ্ন তো বড় বড় ওলীদেরও ভাগ্যে জোটে না। অথচ এক ক্লীন শেভ নওজোয়ান



www.pathagar.com

ফাইটার পাইলটের ললাটে এক বিস্ময়কর স্বপ্ন দর্শনের অভিজ্ঞতা। কোনো আস্তানা বা খানকা শরীফে সিজদাবনত ফকীর দরবেশের পরিবর্তে একজন ফাইটার পাইলটের এমন স্বপ্ন দেখার কারণ মনে হয় খানকা বা হুজরাবাসীদের চেয়ে ভবিষ্যতে মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্ব দিবেন এ ধরনের জানবাজ নরশাদুর্লেরা যারা জংগী বিমান নিয়ে আকাশে উড়তে পারে। এরাই আগামী দিনে হারামাইন শরীফ আর মুসলিম উম্মাহর সীমান্তের হেফাজত করবে।

আব্বা বিমানবাহিনীর এ অফিসারকে বললেন, রাসূলুল্লাহ সা.-এর একটি হাদীস যা হযরত আবু হুরায়রা রা. (ইন্তেকাল : ৬৭৮ হিজরী) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। যখন যুদ্ধের পর যুদ্ধ চলতে থাকবে তখন আল্লাহ অনারব জাতিসমূহের মধ্য হতে একটি জাতির উত্থান ঘটাবেন। যারা যুদ্ধে আরবদের চেয়ে ভাল হবে এবং অস্ত্রশস্ত্রে আরবদের তুলনায় অধিকতর সুসজ্জিত হবে। এদের দ্বারা আল্লাহ দীনের সাহায্য করবেন। মিশকাত শরীফ)

এরপর বললেন, এ স্বপ্ন আরও একটি হাদীসে রাসূল সা.-এর দিকেও অঙ্গুলি নির্দেশ করেছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. নবী করীম সা. থেকে বর্ণনা করেন, শেষ যমানায় এমন মানুষের আগমন ঘটবে যারা পাখির মতো গতিশীল ও হায়েনার মত হিংস্র হবে। (মিশকাত)

আজকের বিশ্বে জঙ্গী ও বোমারু বিমানের ধ্বংসলীলা ও বীভৎস আক্রমণের ইঙ্গিত ঐ হাদীসটিতে রয়েছে। অর্থাৎ ফাইটার উড়োজাহাজের পাইলটরা নিজ দেশ বা বিমান ঘাটি থেকে বিমান নিয়ে উড়াল দিবে, আর অত্যন্ত পাষণ্ডতার সাথে শত্রু দেশের শিশু-নারী-বৃক্ষ সমেত সকলকে ধ্বংস করতে করতে এগিয়ে যাবে। এদের হাত থেকে কারো জান-মাল ইজ্জত-আব্রু কিছুই রক্ষা পাবে না।

তৃতীয় আরেকটি হাদীস এরূপ : রাসূলে আকরাম সা. হযরত আবুযার গিফারী রা.-কে উদ্দেশ করে বলেন, হে আবুযার! যেদিন মদীনাতে এমন দুর্ভিক্ষ হবে ক্ষুধার জ্বালায় তুমি মসজিদ পর্যন্ত যেতে পারবে না। এ ক্ষুধা তোমাকে ফেলে দিবে। সেদিন কি অবস্থা হবে তোমার যেদিন মদীনাতে এত রক্তপাত হবে, যে রক্ত এই কালো পাহাড়কে ঢেকে ফেলবে।

আব্বা তাদের দুজনকে 'হাদীসে দাজ্জাল' শুনিয়ে বললেন, আপনার স্বপ্নের আরও একটি দিক এও হতে পারে যে, আগামী দিনে ইসলাম ও কুফরী শক্তির মধ্যকার যুদ্ধে এয়ারফোর্স সিদ্ধান্তকর ভূমিকা পালন করবে,

www.pathagar.com

তাই আল্লাহ পাক এ স্বপ্ন একজন ফাইটার পাইলটকে তথা আগামীদিনের বিমান সেনাদের দেখিয়েছেন। তাই আজকের এ সময় বা যুগ নিজ ফাইটার জেটের ককপিটে দাঁড়িয়ে আযান দেয়ার উপযুক্ত সময়। আপনাদের দায়িত্বই আপনাদের চিৎকার দিয়ে ডেকে বলছে—আজ মিল্লাত বা উম্মাহ ও হারামাইন শরীফের হেফাযত করা আপনাদেরই দায়িত্ব। অপর একটি হাদীসের মতে, হযরত ঈসা আ. দুনিয়াতে আগমনের পর তার সাহায্যে যেসব এলাকা থেকে বাহিনী যাবে তারা অনারব হবে কিন্তু যুদ্ধবিদ্যা ও অস্ত্রশস্ত্রে আরবদের চেয়ে সমৃদ্ধতর হবে। স্মরণ রাখবেন, আপনাদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে সম্পৃক্ত, তারপর হারামাইন শরীফের হেফাযত এবং এরপর নিজ দেশ মাতৃকার প্রতিরক্ষা। এ সকল দায়িত্ব একই সাথে পালন করতে চাইলে আপনারা আল্লাহ ও কুরআনের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করুন এবং সকল প্রকার সাহায্যের জন্য আল্লাহর কাছেই সর্বদা দোয়া করতে থাকুন।

স্বপ্নের এ তা'বীর শোনার পর সন্তুষ্ট হয়ে এয়ারফোর্সের দুজন অফিসার যখন বিদায় নেয়ার জন্য দাঁড়ালেন তখন আব্বাও দাঁড়িয়ে তাদের সাথে মোসাফাহা করে গেট পর্যন্ত তাদের এগিয়ে দিলেন। এরপর তাদের বললেন, "যেহেতু আপনি স্বপ্নে নবী করীম সা.-এর সাথে সাক্ষাত করেছেন তাই আপনারা সম্মান পাবার যোগ্য। আজ আপনারা যে অস্থিরতা ও বিহ্বলতা আমাকে দিয়ে গেলেন জানি না কতদিন এ অস্থিরতা আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখবে।

সে দিন রাতে আব্বা যখন ডিনারের জন্য বাসার ভিতর আসেন, তার চেহারা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশী চিন্তাগ্রস্ত দেখাচ্ছিল। তিনি এ স্বপ্নের বর্ণনা ও ফলাফল যখন আমাদের বলছিলেন তখন আমরা বেশ ভয় পেয়ে গেলাম।

আজ আমার দিল সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, দাজ্জালের আবির্ভূত হবার দিন আর খুব বেশী দূরে নয়। আজকের এ বিশ্বে হযরত ঈসা আ.-এর আগমনের প্লাটফরমও তৈরী হয়ে গেছে। একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুতবায় বলেন, পৃথিবীর সৃষ্টি ও বনী আদমের সৃষ্টির পর হতে ধরাপৃষ্ঠে ফেতনায়ে দাজ্জালের ন্যায় ভিন্ন কোনো ফেতনা উত্থিত হবে না। দাজ্জাল ইরাক ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী ভূ-ভাগ থেকে উত্থিত হয়ে সে খুব দ্রুত ও স্বল্প সময়ে আশেপাশের এলাকায় ফাসাদ বা বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। বিপর্যয় সৃষ্টি করতে করতে সে সর্বত্র বিচরণ করবে। সুতরাং

www.pathagar.com

হে আল্লাহর বান্দাগণ! এ সময় তোমরা দৃঢ়পদ থেকো। শুনে রেখো এর ফেতনাসমূহের একটি হবে তার সাথে জান্নাত ও জাহান্নাম থাকবে। মূলত তার জাহান্নাম হচ্ছে জান্নাত ও তার জান্নাতের পরিণতি জাহান্নাম। তোমাদের মধ্য হতে কাউকে যদি দাজ্জাল নিজ জাহান্নামে ফেলতে চায় তাহলে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে সূরা আল্ কাহ্ফের প্রথম দশ আয়াত পড়ে নিলে সে আগুন তার জন্য নেহায়েত শান্তিময় হয়ে যাবে, যেমন খলিলুল্লাহ হযরত ইবরাহীম আ.-এর উপর হয়েছিল।

(মিশকাত : জে: ৬)

আমি যখন আব্বাজানের স্মৃতি রোমন্থন করছিলাম তখন হঠাৎ সেই স্বপ্নের তা'বীরের কথা মনে পড়ে গেল যা জানার জন্য পাক এয়ারফোর্সের দুজন অফিসার এসেছিলেন।

বর্তমান যুগে কাবুল ও কান্দাহার আর বসরা-বাগদাদের উপর পরিচালিত ধ্বংসলীলা, ফিলিস্তিন, কাশ্মীর, চেচনিয়া-বসনিয়ার মুসলিম রক্তের বন্যা, গুয়ান্তানামো-বে আর আবু গারিব কারাগারে মানবতা বিরোধী নির্যাতন আজ উম্মতে মুহাম্মদী সা.-কে সেই যুগের কথা মনে করিয়ে দেয়।

* * *

www.pathagar.com

## অসুস্থতার ব্যাপ্তি

বার বার কারাবরণের কারণে আব্বার স্বাস্থ্যগত অবস্থা এমনিতেই সংগীন হয়ে পড়ে। আব্বার সেবা ও খেদমতের জন্য আম্মা তার সমস্ত বাইরের কাজ বাদ দিয়ে দেন। বিশেষ করে ২৫ বছর যাবৎ মডেল টাউন লেডিস ক্লাবে তিনি দারসে কুরআন দিয়ে আসছিলেন। সেটাও তিনি বাদ দেন শুধু আব্বাকে বেশী সময় দেবার জন্য। তবে ইত্যবসরে আম্মার প্রশিক্ষিত শাগরেদদের এক বিশাল দলও তৈরী হয়ে গিয়েছিল। দারস দানের দায়িত্ব তাদের উপর ন্যস্ত করেন আম্মা।

দারসে কুরআনের অনুষ্ঠানে একদিনের ঘটনা। এক মহিলা শিক্ষার্থী আম্মাকে প্রশ্ন করলেন, আপনি কয়টি বিষয়ে এম.এ পাস করেছিলেন ? আম্মা বললেন, বেটী, এম.এ বি.এ পাস তো আপনারা। আমি দিল্লীর কুইন ম্যারী স্কুলে মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়েছি। এ উত্তর শুনে সেই মহিলা আবার জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে আপনি এতো জ্ঞান অর্জন করেছেন কিভাবে ? এ প্রশ্নের জবাবে আম্মা যা বলেছিলেন তা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। আম্মা বলেছিলেন, "আমি এমন এক আলেমে দীনের সাথে জীবন যাপন করছি যার এক ঘন্টার কথাবার্তা শুনে মানুষের সেই জ্ঞান অর্জন হয় যা সারারাত অধ্যয়ন করেও অর্জন করা সম্ভবপর হয়ে উঠে না।"

যখন আব্বার অসুস্থতা ক্রমান্বয়ে বেড়ে যেতে থাকলো তখন একদিন তিনি আমাদের ডেকে বললেন, আমি আমার শরীরের উপর অনেক নির্যাতন করেছি। শরীর হাড়গোড়কে কোনো আরাম বা বিশ্রামের সুযোগ দেইনি। আমার চোখগুলোকে নিদ্রাগমনের প্রাকৃতিক নিয়মের বাইরে জাগিয়ে রেখেছি বহু রাত-দিন। আমার চোখগুলো ঘুমাতে চাইতো। কিন্তু আমি লিখতে চাইতাম। দিনের বেলায় আমার জামায়াতী ব্যস্ততার কারণে লেখার সুযোগই পেতাম না। তাই রাতই তো এমন এক সময় ছিল যখন আমি মনোযোগ দিয়ে লিখতে পারতাম। রাতের খাবার আর সালাতুল এশার পর যখন কাজ করতে বসতাম তখন প্রায় দিনই ফজরের আযান হয়ে যেত। আচ্ছা এমন যদি না করতাম—তাহলে 'তাফহীমুল কুরআন' কিভাবে সম্পন্ন হতো ? ব্যস এখন এ চোখগুলো আমার কাছ থেকে বদলা নিচ্ছে। এখন আমি ঘুমাতে চাই, কিন্তু আমার চোখ আমাকে ঘুমাতে দেয় না, ওরা জেগে থাকে। আমি এ চক্ষুদ্বয়কে জেগে থাকায় এমন অভ্যস্ত করে

www.pathagar.com

তুলেছি যে এগুলো এখন ঘুমের ধারে কাছেও যেতে চায় না। আমি এখন চাই যে, আমার মস্তিষ্ক চিন্তা বন্ধ করুক যাতে আমি শান্তিতে ঘুমাতে পারি। কিন্তু মস্তিষ্ককে চিন্তার এমন অভ্যাসে অভ্যস্ত করেছি যে, সে চিন্তা না করে বসে থাকে না, আমাকে ঘুমাতে দেয় না। আমার শরীরের সমস্ত অংগ-প্রত্যংগ আমার কাছ থেকে বদলা নিচ্ছে। পূর্বে আমি এদের আরাম করতে দেইনি, আজ তারা আমাকে আরাম করতে দিচ্ছে না।

ব্যথানাশক ঔষধ সেবন করতে করতে আব্বার অবস্থা স্বতই কাহিল হয়ে পড়ছিল। একদিন কথায় কথায় আম্মা বললেন, আবহাওয়ার পরিবর্তন হয়তো আপনার শরীরকে ভালো করবে। এজন্য আমি আহম্মদ ফারুককে বলেছি, সে যেন আপনাকে আমেরিকা নিয়ে যায় এবং সেখানে নিশ্চিন্তে চিকিৎসা হবে।

আব্বার অসুস্থতা দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকলে আমেরিকা থেকে আমাদের ভাই ড. সাইয়েদ আহমদ ফারুক মওদূদী আসেন। তিনি অনেক অনুনয় বিনয় করে ২৬ মে ১৯৭৯ সালে আব্বাকে আম্মাসহ আমেরিকা নিয়ে গেলেন সুচিকিৎসার জন্য। আমেরিকাতে পুরো মাস চিকিৎসার পর স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটলে তিনি সীরাতে সরওয়ারে আলম-এর উপর কাজ শুরু করে দেন।

সাময়িক সুস্থতা এ ব্যস্ত মানুষের জীবনের ব্যস্ততার ব্যতয় ঘটাতে পারেনি। বিশ্রাম নেয়ারও সুযোগ হয়ে উঠেনি, কারণ আমেরিকা-কানাডার সকল প্রান্ত থেকে সাক্ষাৎ প্রার্থীদের এক চলমান প্লাবন সৃষ্টি হয়। এদের অধিকাংশই ছিলেন এমন যারা আব্বার লেখা সাহিত্য পড়ে ইসলাম ধর্ম কবুল করেন। সাক্ষাৎকারীদের মধ্যে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গও ছিলেন। বিশেষ করে বিশ্বখ্যাত উপন্যাস (The Roots)-এর লেখক আলেক্স হ্যালী অন্যতম। অনেক দূর দূরান্তের পথ পাড়ি দিয়ে সাক্ষাত করেন ও নিজ অটোগ্রাফসহ The Roots গ্রন্থ উপহার দেন।

* * *

www.pathagar.com

## বাফেলো যুক্তরাষ্ট্র : সেপ্টেম্বর ১৯৭৯

আব্বা অত্যন্ত আশাবাদী ছিলেন যে সীরাতে সরওয়ারে আলমের উপর কাজ শেষ করে ফেলবেন। কিন্তু ৮ সেপ্টেম্বর মারাত্মক হার্ট এ্যাটাকের শিকার হন তিনি। শারীরিক অবস্থা কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে আসছিল। এরই মধ্যে ২১ তারিখে আবার অসুস্থতা কিছুটা বেড়ে যায়। হঠাৎ কিডনী ও লিভার ফ্যাংশন বন্ধ হয়ে যায় ফলে পরিস্থিতি আরও গুরুতর হয়ে উঠে। অবশেষে সেই সময় এসে উপস্থিত হলো যেটা কারও ইচ্ছায় পরিবর্তন যোগ্য নয়-২২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৯। বাফেলো হাসপাতালে গ্রীনিচ মান সময় দুপুর পৌনে একটায় আব্বাজান তাঁর রাফিকে আ'লার সান্নিধ্যে চলে গেলেন। (انَّا لِلّٰه وانَّا الَيْه رَاجِعُوْن)

এ সংবাদ নিয়ে আহমদ ফারুক যখন হাসপাতাল থেকে ফিরে আসেন তখন তিনি প্রচণ্ড শোকে মুহ্যমান। আম্মাজান এ সময় বিনিদ্র রজনী যাপন করে আসা ক্লান্ত-শ্রান্ত, শোকর্তি ও সাথে সাথে ক্ষুধার্ত পুত্রকে নিজ হাতে চা বানিয়ে দেন এবং বিস্কুট খাওয়ান। প্রচণ্ড শোকের এ অবস্থায় আম্মা অতুলনীয় ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন পূর্বক নিজ শোককে চেপে ধরে শোকাতুর পুত্রকে বললেন, 'বেটা শুকরিয়া করো, তুমি তোমার আব্বাজানকে দেখেছো। তাঁরই ছায়াতলে কতগুলো বছর কাটাতে পারলে, তিনি ১৯৫৩ সালেই ফাঁসির মঞ্চে আরোহণের জন্য তৈরী হয়ে গিয়েছিলেন। যদি সেদিন তার ফাঁসি কার্যকর হয়ে যেতো তাহলে তুমি তো স্মরণও করতে পারতে না তোমার আব্বার চেহারা কেমন ছিল। তিনি দেখতে কেমন ছিলেন। কেমন ছিল তার কণ্ঠস্বর । আল্লাহু আকবর, এ কেমন সহিষ্ণুতা, এ কেমন তাওয়াক্কুল আলাল্লাহ।

এরপর আম্মা সকলকে ধৈর্যের পরামর্শ দিয়ে বললেন, 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন'- পড় এবং কথা বলো না। সেখানে সমবেত সকলে সেদিন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে এ মহীয়সী নারীর ধৈর্য দেখেছিল।

আমাদের মামা ড. জালাল শামসী সংবাদ পেয়ে কানাডার টরেন্টো থেকে নিজে গাড়ী ড্রাইভ করে বাফেলো আসেন। তিনি যখন আম্মার সমীপে উপস্থিত হন তখন তার অবস্থা ছিল শোকে দুঃখে বিহ্বল। কিন্তু মামা আম্মাকে দেখে অবাক। তিনি বলতে থাকলেন, আপাজান! আমি টরেন্টো থেকে বাফেলো পর্যন্ত কাঁদতে কাঁদতে এসেছি। পথে চিন্তা করছিলাম আপনার সামনে গিয়ে দাঁড়াবো কেমনে ? আপনাকে কি

www.pathagar.com

সান্ত্বনার বাণী শোনাবো। কিন্তু আপনাকে দেখে তো আমার বহমান অশ্রুধারা থমকে গেছে। এমনি অবাক লাগতো তখনও যখন ভাইসাহেব জেলে চলে যেতেন। আর আমরা দেখতাম আপনি ছোট ছোট বাচ্চাদের সাথে নিয়ে নিশ্চিন্তভাবে সংসার চালাচ্ছেন। আপা বলুন কোন্ রূহানী শক্তির জোরে আপনি এসব করেন ?

আম্মা জবাবে বললেন, মহান আল্লাহর সত্তার উপর ঈমান, তাওয়াক্কুল ও সবর-এর ন্যায় গুণাবলী দ্বারাই মানুষ কঠিন থেকে কঠিনতর দুঃসময়েও ভালোভাবে অতিক্রম করতে পারে।

* * *

www.pathagar.com

# জন এফ কেনেডী বিমানবন্দরে

আহমদ ফারুক ভাই একটি উড়োজাহাজ চার্টার করে আব্বার কফিন নিউইয়র্কের জন এফ কেনেডী বিমানবন্দরে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেন। এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ টিভি চ্যানেল আব্বার ইন্তেকালের খবর প্রচার শুরু করে। ফলে নিউইয়র্ক ও আশেপাশের অঙ্গরাজ্যে বসবাসরত বিভিন্ন মুসলিম দেশের অধিবাসীরাও জন এফ কেনেডী বিমানবন্দরে জানাযা পড়ার জন্য সমবেত হতে থাকেন। আমার ভাই আহমদ ফারুক আম্মাকে প্যাসেঞ্জার লাউঞ্জে বিশ্রামের জন্য অবস্থান করতে বলেন। এরই মধ্যে পাক-ভারত উপমহাদেশ, তুরস্ক, আরব ও আফ্রিকার মুসলিম মহিলারা এসে সেখানে বসেন। তাদের সাথে আগত পুরুষরা বাইরে জানাযার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কিছু পাকিস্তানী মহিলা আম্মার আশেপাশেই বসে ছিলেন। তারা নিজেদের মধ্যে আলাপচারিতায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। অনেকে বলতে থাকেন, বাফেলো থেকে ডেডবডি আসবে, জানিনা পৌঁছলো কিনা ।

তাদের আলাপ শুনে আম্মা বললেন : লাশ পৌঁছে গেছে। আলাপরত মহিলারা হতভম্ব হয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, আপনি কি করে জানলেন, লাশ পৌঁছে গেছে ? আম্মা বড়ই ধীরস্থিরভাবে জবাব দিলেন, কেন, আমিই তো লাশের সাথে এসেছি। এরপর মহিলারা অত্যন্ত উৎসুক দৃষ্টিতে জানতে চাইলেন, তার সাথে আপনার কি সম্পর্ক ? প্রশ্নের জবাবে আম্মা বললেন : তিনি আমার স্বামী ছিলেন।

আলাপরত মহিলারা চিৎকার দিয়ে বললেন, হায় হায়! বেগম সাহেবা আপনি কি প্রচণ্ড এতমিনানের সাথে শোকের পাথর বুকে বেধে নিশ্চিন্তে বসে আছেন। আমরা সারাপথ বিলাপ করতে করতে এসেছি। আপনাকে দেখে আল্লাহর কথাই মনে পড়ে গেল। এরপর পর্যায়ক্রমে সকল তুর্কী ইন্দোনেশীয়, আরব ও আফ্রিকান মহিলারা জেনে গেলেন আম্মার পরিচয়। সকলেই আম্মার নিকট এসে দুঃখ প্রকাশ করলেন আর বললেন, 'এরই নাম সবর'।

ভিতরে প্যাসেঞ্জার লাউঞ্জে যখন এ দৃশ্যের অবতারণা হয় তখন বাইরে চলছিল জানাযা। স্থানের অভাবে একে একে ছয়বার জানাযা অনুষ্ঠিত হয় নিউইয়র্ক এয়ারপোর্টে।

www.pathagar.com

লাশ বহনকারী উড়োজাহাজ যখন লন্ডন পৌঁছে তখন হিথ্রো বিমান বন্দরে সমগ্র ইউরোপ থেকে আগত শত শত মুসলমান জানাযায় অংশ নেন। আসল বিষয় হলো আব্বাজান এমনভাবে বিদায় নিলেন যেন তিনটি মহাদেশের মুসলমানদের সশ্রদ্ধ বিদায় নিয়ে নিজের শেষ আবাসস্থলে এসে শুয়ে পড়লেন।

শেষ পর্যন্ত আম্মা লাশ নিয়ে লাহোর পৌঁছলেন। আম্মা পৌঁছেই নিজ সন্তানদের সান্ত্বনা দেন এবং সবর করবার পরামর্শ দিয়ে বললেন, তাঁর জন্য কেঁদো না। মাটির তৈরী এ শরীর তো ময়লা বা ব্যবহৃত কাপড়ের উপমা, কারণ দেহ হচ্ছে রূহের পোশাক বা পরিচ্ছদ। দেহের ছদ্মাবরণে লুকিয়ে থাকে রূহ। পোশাকের রং আস্তে আস্তে নষ্ট হয়, ছিঁড়ে যায়, তালি দিতে হয়। এরপর রিপু করা লাগে আর শেষ পর্যন্ত রূহ এ পোশাক খুলে রেখেছে। আর এর স্থলে আল্লাহ তা'আলার নূরের লেবাস পরে নিয়েছে রূহ। এখন তোমাদের আব্বা সম্পূর্ণ ভালো আছেন। তিনি আরামে বিশ্রামে তার প্রকৃত মূল্যায়নকারীর কাছে পৌঁছে গেছেন। এ তোমরা যা দেখছো তা তো রূহের ময়লা কাপড়চোপড়, যা আমেরিকা থেকে তাবুতে (কফিন বক্সে) বন্দী হয়ে এসেছে। ছেড়া কাটা ময়লা কাপড়ের জন্যও কি কেউ ক্রন্দন করতে পারে?

এভাবেই আম্মা সকল সন্তানকে সান্ত্বনা দেন ও সবর করতে বলেন। এ ছিল তার কথা বলার এক বিশেষ ভঙ্গি। জানি না সে কথাগুলোর মধ্যে কি যাদু ছিল, যে কথাগুলো শুনতেই আমাদের কান্না বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তিনি অতুলনীয় হিম্মত ও সাহসিকতার সাথে এ শোক ও দুঃখের সাগরের তরী নোঙ্গর করেন ধৈর্যের বন্দরে।

* * *

www.pathagar.com

## আম্মাকে নিয়ে মক্কা মদীনায়

আমি সে সময় জেদ্দা সৌদি কলেজ ফর উইমেন্স এর ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করছিলাম। তার নিকট অনেক অনেক অনুনয় বিনয় করে আম্মাকে সংগে করে সৌদি আরবে নিয়ে আসলাম। প্রথমে তিনি যেতে রাজী হননি। আম্মা বললেন, মেয়ের বাড়ীতে গিয়ে কেমন করে থাকবো ? আমি অনেক বুঝালাম, বললাম আমাকে আপনি পুত্রদের মতই লালন-পালন করেছেন, পুত্রদের মতই লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করেছেন। আর আজ আমি ছেলেদের মতই রোজগার করি। তাই আমাকে ছেলেই মনে করুন। আপনার এ অবস্থার চিকিৎসা শুধু ঔষধে নয় বরং মক্কা-মদীনার বাতাসে হবে। একথা শুনেই তিনি রাজী হয়ে যান। সৌদী আরব পৌছে আম্মার জন্য আলাদা ইকামার ব্যবস্থা করলাম, যাতে করে আসা যাওয়ায় সমস্যা না হয়। প্রথমবার ওমরাহ পালন করে আসার পর সকল ঔষধ-পথ্য তুলে রেখে দেন এই বলে যে, এসবের এখন আর দরকার হবে না।

পবিত্র ভূমিতে আবার এলো রমযান। রমযানুল মুবারকে কয়েকবার ওমরাহ করে শেষ দশক কাটাতে আমরা আম্মাকে সঙ্গে করে মদীনা মুনাওয়ারাহ চলে গেলাম। মসজিদে নববীর, বাব-উন-নিসা (মহিলাদের দরজা) যেখানে ছিল, তার ঠিক নিকটবর্তী স্থানেই ছিল পাকিস্তান হাউস। আমরা দশদিন সেখানেই অবস্থান করলাম। আম্মা প্রতি ওয়াক্তে প্রথম কাতারে দাড়ানোর জন্য আগ্রহী ছিলেন। এজন্য আমরা তড়িঘড়ি দৌড়ঝাপ দিয়ে আসার মত করে মসজিদে আসতাম প্রথম কাতারে স্থান পাবার জন্য। এ ধরণের তড়িঘড়ির মধ্যে আম্মা প্রায়ই ঔষধ খেতে ভুলে যেতেন, আর সেহেরীর সময় পার হয়ে যেত। অথচ ব্লাড প্রেসার আর হাঁপানীর ঔষধ সেবন ছিল অত্যন্ত জরুরী।

একদিন আমি আরয করলাম, ঔষধ সময়মত ও নিয়মিত খাওয়া উচিত, ঔষধ খেতে ভুলে যাওয়া ঠিক নয়। বিশেষভাবে হার্ট ও প্রেসারের ঔষধ তো মোটেও ছাড়া যাবে না, খোদা-না-খাস্তা এমন না হয় যে, আপনি মসজিদে নববীর কাছে গিয়েও মসজিদে প্রবেশ থেকে মাহরূম হয়ে যান। এসব শুনে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন :

*"ও জো বেচ থে দাওয়া-এ-দিল,*
*ও দোকান আপনি বাড়হা গ্যায়"*

অর্থ: সে যে বিক্রি করতো দিলের দাওয়াই, দোকান তো সে-ই সাজিয়েছে।"
আমি সেখান থেকে একটু অন্য কাজে গিয়ে ফিরে এসে দেখি আমার

www.pathagar.com

পুত্র আতাহার (জন্ম ১৬ নভেম্বর ১৯৭১) আম্মাকে জিজ্ঞেস করছে, আম্মি তো বলেন, নানা বই-পুস্তক লিখতেন, আর আপনি বলছেন তিনি হার্টের ঔষধ দিলের দাওয়াই বেচতেন। দেখলাম আম্মাজান এ ছোট্ট শিশুকে অপরিসীম ধৈর্যের সাথে বুঝাচ্ছেন, তোমার নানা যা লিখতেন, তা দিয়ে মানুষের মনের রোগের চিকিৎসা হতো।

ঊনত্রিশতম রাতের ঘটনা। এ দিনই হারামাইনে খতমে কুরআন অনুষ্ঠিত হয়। পুরো মদীনা আর বিশেষভাবে মসজিদে নববীতে তিল ধারণের ঠাঁই ছিল না। এজন্যই আমরা এশার নামাযের বহু পূর্বেই প্রথম কাতারে গিয়ে অবস্থান নেই। ইকামাত দেয়ার কয়েক মিনিট পূর্বে মসজিদের দু'জন মহিলা কর্মী একজন মহিলা পুলিশ এসে হুকুম দিতে শুরু করলো ঃ এরজে ওরায়া, এরজে : পেঁছনে যাও পেঁছনে যাও। আমি তখন পেছনে তাকিয়ে দেখি মুসলিম নারীসমাজের মহাসমুদ্র। কারো হাতে- পায়ে-গায়ে পাড়া না দিয়ে যাওয়া যাবে না আর পেছনে দাঁড়ানোর কোনো স্থান নেই।

আমি সৌদি পুলিশকে শক্তভাষায় বললাম, "আমরা পেছনে যাব কেন ? তারা আমাকে সৌদী মনে করে বললো, "বাহরাইন থেকে কিছু ভিআইপি এসেছেন।"

এবার আমি ধমকের সুরে পুলিশদের বললাম, "আমরা সবাই ভিআইপি এ মসজিদের বিশেষ মেহমান। আর এটা হলো মাসজিদুর রাসূলুল্লাহ সা.। আমরা রাসূলুল্লাহ সা.-এর মেহমান। আর মসজিদে নববী কারো রাজপ্রাসাদ নয়।" আমি কথা বলছিলাম আরবীতে। আমার কথোপকথন শুনে পিছনের কাতারে বসা সৌদি মহিলারা এক বাক্যে একত্রে বলে উঠলো, 'সহীহ সহীহ' কালাম মযবুক।'

অর্থ : ঠিক ঠিক, বিলকুল ঠিক। খোদার কসম একদম উচিত কথা।

এরই মাঝে নামায শুরু হলো। মহিলা পুলিশগুলো চলে গেল। ফরয নামাযের পর সৌদী মহিলারা আমার পরিধেয় দেখে প্রশ্ন করলেন, আল্লাহর কসম করে বলো তোমরা কি পাকিস্তানী ? আর তুমি আরবী শিখেছো কোথায় ? তাদের বললাম, আমার আব্বা ও আম্মার কাছে। এটা শুনে সৌদী মহিলারা আম্মার হাতে চুমু খেল। ঈদের নামায পড়ে আমরা আবার জেদ্দায় ফিরে আসলাম। একদিন আম্মাকে জিজ্ঞেস করলাম এবার তো আপনি মদীনায় থেকে ইবাদাত করে সন্তুষ্ট, তাই না ? একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন,

www.pathagar.com

*"রুয়ে গুল সেয়র না দিদাম ও বাহার আখের গুদ"*

অর্থ: আমরা আনন্দ ভ্রমণ করতেই পারলাম না,
আর এ বসন্তকাল ফুরিয়ে গেল।

সে বছর আমার মেয়ে রাবেয়ার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেয়ার বছর। আমি আমার মেয়েকে প্রায়ই বলতাম, বেটী ! তোমাকে যে করেই হোক 'এ' গ্রেড পেতে হবে। ভালো করে প্রিপারেশন নাও। এ রেজাল্টের উপরই ভবিষ্যতে উচ্চ শিক্ষার অনেক কিছু নির্ভর করে। একথা আম্মা যেন মনের খাতায় নোট করে নেন। এরপর থেকে দেখতাম তার নামায খুব দীর্ঘ হচ্ছে। একদিন বলে ফেললাম, ইদানিং দেখছি আপনি দীর্ঘ সময় ধরে নামায পড়ছেন। এতো সময় দিয়ে নামাযে দাঁড়িয়ে থাকলে আবার স্বাস্থ্যের না কোনো অসুবিধা হয়ে যায়। তিনি আমার কথার জবাব দিলেন আমার কথা দিয়েই। এক সপ্তাহ পূর্বে আমি রাবেয়াকে যে 'এ' গ্রেডের কথা বলেছিলাম তাই আমাকে শুনিয়ে দিলেন আম্মা। বললেন, পরীক্ষা তোমার মেয়ে যেমন দিবে, আমাকেও দিতে হবে মা। আমার পরীক্ষার উপর সমস্ত পরকালীন জীবন নির্ভর করছে। আমি প্রত্যেক বিষয়ে 'এ' গ্রেড পেতে চাই। প্রতি ওয়াক্ত নামাযে 'এ' গ্রেড, প্রত্যেক রোজা ওমরাহ যেন 'এ' গ্রেডের হয়।

আমরা প্রায়ই লং ড্রাইভে বেরুতাম। কখনো তায়েফ আবার কখনো মদীনা। গাড়ীতে লম্বা সফর হলে আম্মা ড্যাশ বোর্ডের উপর একখানা কুরআন শরীফ রেখে মুখস্ত করতে থাকতেন। এভাবেই সর্বদা তিনি নিজের জ্ঞান বৃদ্ধি করতে থাকেন। গাড়ীতে বসেই তিনি সূরা আল্ ফাতাহ মুখস্ত করেন। একবার সূরা আল্ কাহ্ফ-এর প্রথম দশ আয়াত ও শেষ দশ আয়াত মুখস্ত করেন। মসজিদে নববীতে পৌঁছেই সদ্য মুখস্ত আয়াতগুলো দিয়ে তিনি নামায পড়লেন। এরপর আমাদের একটি হাদীস শুনালেন, বললেন : "সর্বাধিক মর্যাদা সম্পন্ন কুরআন তেলাওয়াত হচ্ছে সেটা যা নামাযে দাঁড়িয়ে তেলাওয়াত করা হয়।"

যখন সূরা আল্ কাহ্ফের প্রথম ও শেষ দশ আয়াত মুখস্ত করার পর প্রথমবার মসজিদে নববীতে দু'রাকআত নফল নামাযে কুরআনের সেই অংশ তেলাওয়াত করে বললেন, আমি আমার অন্তরে বিশাল এক সম্পদ অনুভব করছি। বিশ্বাস করো সকল শক্তির উৎস, দুনিয়াবী শক্তিও আসলে মানুষের মূল শক্তির উৎস তার মন তার হৃদয়। অনেকে এ শক্তি বাইরে খুঁজে ফেরে।

www.pathagar.com

একথাগুলো শুনে আমি আরও ভালোভাবে বুঝতে শিখলাম, কেন আম্মা জিন্দেগীতে কখনও আব্বার কাছে বিশেষ কিছু Demand করেননি। আসলে এ সকল পার্থিব বস্তুসামগ্রীর তার কোনো প্রয়োজনই ছিল না। তাঁর অন্তকরণ এতো বিশাল ঐশ্বর্যে ভরপুর ছিল, এতো সুন্দর ও শক্তিশালী ছিল যে, বাইরের ঐশ্বর্যের প্রতি তার চাহিদাই সৃষ্টি হয়নি।

মদীনার মতো মক্কা শরীফেও এক দু-সপ্তাহ অবস্থান করে ইবাদাত করার আকাঙ্খা তার মধ্যে তীব্র হয়ে উঠলো। আমি হাফেজ আবদুল হক সাহেবের স্ত্রী ফারহানা আপার মাধ্যমে মক্কা শরীফে একটি ফ্ল্যাটের ব্যবস্থা করলাম। দু-সপ্তাহ ফারহানা আপা আম্মাকে সঙ্গ দিলেন ও অনেক খেদমত করলেন।

আম্মাজানের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল তিনি অনেক কথার জবাব কবিতা আর শ্লোকের দ্বারা দিতেন। মক্কা শরীফ থেকে জেদ্দায় আসার পর জিজ্ঞেস করলাম কেমন হলো আপনার ইবাদাত-বন্দেগী ? জবাবে তিনি বেশ কিছু ফার্সী কাব্য শোনালেন।

* * *

www.pathagar.com

## আম্মা সম্পর্কে আব্বা

আব্বার একটি কথা আমার প্রায়ই মনে পড়ে। কথাটি তিনি আমার মামা মরহুম খাজা মুহাম্মদ শফির নিকট বলেছিলেন। মামা সেদিন অসুস্থ আম্মাকে দেখতে এসেছিলেন। আব্বা মামাকে বললেন, যখন লোকেরা শ্লোগান দেয় মাওলানা মওদূদী জিন্দাবাদ। জামায়াতে ইসলামী জিন্দাবাদ। তখন আমি মনে মনে বলি, মাহমুদা বেগম জিন্দাবাদ, যখন কোনো সৈন্যদল যুদ্ধজয় করে ফিরে আসে তখন তার সিপাহ্‌সালার বা সেনাপতিকে গলায় মালা আর পুষ্প বৃষ্টি দিয়ে বরণ করে নেয়া হয়। কিন্তু এ সময় পরিচয় গুপ্ত সেই সিপাহীর কথা কেউ স্মরণই করে না যে নিজের জীবন বাজী রেখে সবকিছু দান করে এ অসম্ভব বিজয়কে সম্ভব করেছিল। জিন্দাবাদের শ্লোগান মুখরিত ময়দানে কারো আত্মদান, অর্থদান, বিশ্বস্ততা আর জানবাজীর কথা কারই বা মনে থাকে।

আম্মা ওস্তাদদের দারুণ তাজিম ও সম্মান করতেন। দারুল ইসলাম পাঠানকোটে থাকা অবস্থায় তিনি মাওলানা আমিন আহসান ইসলাহীর (মৃত্যু : ১৫ ডিসেম্বর ১৯৯৭) দারসে কুরআনের নিয়মিত শ্রোতা ছিলেন। মাওলানা ইসলাহী আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত দারস দিতেন। মাগরিবের পর বাসায় এসে আম্মা দারসের বিষয় মুখস্ত করতেন। এভাবেই মাওলানা আবদুল গাফ্‌ফার হাসানের দারসে হাদীসের তালিম নেন তিনি। আম্মা এদের দু-জনকেই নিজের ওস্তাদ মানতেন। তাই এদের দু-জনের জামায়াত থেকে আলাদা হওয়ায় তিনি দারুণভাবে শোকাহত হন। মাওলানা ইসলাহী সাহেবের ছোট মেয়ের কাছে তিনি মায়ের মতোই ছিলেন। এজন্য তিনি বলতেন, আমার কন্যা তিনজন নয় চারজন।

আজ মনে পড়ছে সেই কথা। আব্বার ইন্তেকালের পর যখন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক আম্মাকে সিনেটের সদস্য হওয়ার এবং ডেপুটি চেয়ারম্যান হবার প্রস্তাব দেন। কিন্তু আম্মা তার মরহুম স্বামীর নাম নিয়ে বাণিজ্য করতে মোটেও রাজী হননি। জিয়াউল হকের প্রস্তাব নিয়ে প্রথম আসেন আতিয়া এনায়েত উল্লাহ, তাঁকে তিনি ফিরিয়ে দেন ভালোভাবে সৌজন্যের সাথে। কিন্তু যখন নিসার ফাতেমা আপা একই প্রস্তাব নিয়ে আসেন তখন তাঁকে আম্মা একটি প্রিয় কাব্যাংশ শুনিয়ে দেন।

www.pathagar.com

*সওদাগিরি নাহি ইয়ে ইবাদাত খোদা কী হায়।*

অর্থ : সওদাগিরি না, এ তো আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদাত।

এরপর একটি নাতিদীর্ঘ বক্তব্যে তিনি যা যা বললেন তা তুলে ধরছি এখানে। তিনি বললেন, "এ কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান দুনিয়া অর্জনের জন্য নয়, এতো আখেরাতে সাফল্যের মাধ্যম। আমি আমার পূত-পবিত্র চরিত্র স্বামীর নামে বাণিজ্য করতে পারবো না। মানুষ নিজের ও নিজ সন্তানদের পার্থিব সাফল্যের জন্য সংগ্রাম করে আর মাওলানা সাহেব তো আল্লাহর দীনের বিজয় ও সাফল্যের জন্য তার সারাটা জীবন নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম-সাধনা করে গেছেন। তার চরিত্র ছিল মালিক নাসরুল্লাহ খান আযীযের কবিতায়।

*মেরী জিন্দেগী কা মাকসাদ তেরী দীন কী সরফরাযী,*
*মাই ইসি লিয়ে মুসলমান, মে ইসি লিয়ে নামাজী।*

অর্থ : আমার জীবনের মিশন তোমার দীনের বিজয়,
আমি এজন্যই মুসলিম, এজন্যই নামাযী।

এরপর বললেন, এ দুনিয়াতে আমার এবং আমার বাচ্চাদের এ নাম নিয়ে ব্যবসা করার কোনো দরকার নেই। আল্লাহর বিশাল রহমত তিনি আমাদের এমনিতেই অনেক দিয়েছেন, এ নামের প্রয়োজন আমাদের তখন হবে যেদিনের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ওয়াদা করেছেন এভাবে–

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ط كُلُّ امْرِيءٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ ○

অর্থ : "যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের সন্তানরাও ইসলামের পথে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে, আমরা তাদের সেসব সন্তানদেরও (জান্নাতে) তাদের সাথে একত্রিত করবো। আর তাদের আমলের কোনো কমতি হবে না। প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ উপার্জনের বিনিময় গচ্ছিত রাখা আছে।" (সূরা আত তূর ঃ ২১)

ব্যস। আমি দোয়া করি আল্লাহ তাআলা যেন আমার ও আমার সন্তানদের পরিণতি তার সাথে করেন। আমাদের সকলকে জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ ও ইনফাক ফী সাবিলিল্লাহর ওয়ারিস বানিয়ে দিন এবং জান্নাতুল ফেরদাউসে আমাদের সকলকে একত্রিত করুন। আমীন। মাওলানা সাহেব

www.pathagar.com

তার স্রষ্টাকে রাজি করেছেন আর কোনো সৃষ্টির পরোয়া করেননি। সারা বিশ্বের সাথে লড়াই করেছেন কিন্তু স্রষ্টাকে নারাজ করে কোনোদিন সৃষ্টিকে খুশী করার চেষ্টাও করেননি।

*"তওহীদ তো ইয়ে হ্যায় খোদা হাশর মে কাহ দে*
*ইয়ে বান্দা দো আলম হে খাফা মেরে লিয়ে।*

অর্থ : তাওহীদের মর্ম হলো, বিচার দিনে স্রষ্টা বলবেন,
আমারই জন্য বান্দা তার পার্থিব সুখে ছিল অমনযোগী।

* * *

www.pathagar.com

## শেষ দিনগুলোতে

জীবন সায়াহ্নে এসে আম্মা সদাসর্বদা আব্বার স্মরণ করতে থাকতেন। একদিন গরমকালে হঠাৎ বিদ্যুৎ দীর্ঘ সময়ের জন্য চলে গেল। আম্মা যেহেতু হাঁপানির রোগী ছিলেন এজন্য অতিগরম ভ্যাপসা গরম তাঁকে কাহিল করে ফেলতো। বিদ্যুৎ বিহীন অবস্থায় তিনি কিছুটা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন, পরক্ষণেই উঠে বললেন, "তোমার আব্বাজানের আওয়ায শুনতে পেলাম, তিনি আমায় ডেকে বলছেন, তুমি ওখানে বসে কি করছো ? উপরে চলে আসো, দেখো কি সুন্দর বাতাস বইছে।" এরপর আম্মা আক্ষেপ করেই বললেন, বলোতো আমি নিজে থেকে সেখানে যাব কেমনে ? এজন্য তো আল্লাহর তরফ থেকে ডাক আসতে হবে।

স্বাস্থ্য যখন ক্রমান্বয়ে অবনতিশীল হতে থাকলো তখন আমাদের ছোট বোন আসমা আম্মাকে ওর বাসায় নিয়ে গেল, মন দিয়ে সেবা করার জন্য। ওর বাসা আব্বার বাসার পাশেই ছিল। কয়েকদিন পর আমি দেখতে গেলাম। গিয়ে শুনতে পেলাম তিনি কারও সাথে কথা বলছেন না এমনকি কিছু খাচ্ছেনও না। আমি তার শিয়রে দাঁড়িয়ে শুধু এতটুকু বললাম–

*"দিল্লী জো এক শহর থা আলম মে ইন্তেখাব"*
অর্থ : দিল্লী ছিল নগরকুল শিরোমণি।

আম্মা সাথে সাথেই পরের লাইনগুলো পড়তে শুরু করলেন ঃ
*"রাহতে থে মুনতাখিব হি জাহা রোজগার কে*
*ইস কো ফালাক নে লুট কার বিরান কার দিয়া*
*হাম রেহনে ওয়ালে হেঁ ইসি উজড়ে দিয়ার কে।"*
অর্থ : বসবাস করতো সেথায় নামী-দামী, জ্ঞানী-গুণী;
দস্যুরা একে লুটেপুটে করে দিয়েছে বিরাণ ভূমি।
হোক শশ্মান, হোক বদ্ধভূমি, সে তো আমারই জন্মভূমি।

কবিতা শুনে আমি বললাম. কে বলে আপনি অসুস্থ। আপনি বিলকুল ঠিক আছেন। এই নিন খাবার। এরপর তিনি পুরানো দিল্লীর স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে খানা খেলেন। দিল্লীর কথা বলার সময় তাকে বেশ হাস্যোজ্জ্বল লাগছিল। দিল্লীতেই তার জন্ম। সেই শহরেই বেড়ে উঠেছিলেন তিনি। স্কুল জীবনের পাঠ চুকিয়ে যৌবনের প্রারম্ভে সেই শহর দিল্লীর এক সম্ভ্রান্ত যুবক মাওলানা আবুল আ'লা মওদূদীর সাথেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন আম্মা। তার দাম্পত্য জীবন শুরু হয়েছিল পুরানো দিল্লীতে।

www.pathagar.com

এমনি আরেক দিনের ঘটনা। প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কাউকে চিনতে পারছিলেন না। শুধু বলছিলেন, 'কুচে পণ্ডিত' যাব। আমি গেলে আসমা জিজ্ঞেস করলো, 'কুচে পণ্ডিত' কি ? আসমাকে বললাম, 'কুচে পণ্ডিত' দিল্লীর একটি ঐতিহ্যবাহী এলাকা, যেখানে তার শ্বশুরালয় ছিল। মানে আব্বার বাড়ী। এরপর আমি দিল্লীর কয়েকটি এলাকার কথা বললাম, চাঁদনী চক, কাশ্মীরী দরজা, তুর্কমান দরজা ইত্যাদি ইত্যাদি। আনন্দিত হলেন, হাসলেন। কিন্তু খেতে রাজী হলেন না। অতঃপর আমি বললাম :

*"সওদাগিরি নেহি, ইয়ে ইবাদাত খোদা কী হায়"*

আম্মাজান কিছুক্ষণ কি যেন চিন্তা করলেন তারপর কবিতার বাকী লাইনগুলো পড়লেন। এরপর আমার হাতে স্যুপ খেলেন।

একেবারে শেষ দিকে কাউকে চেনা তার জন্য অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছিল। একদিন মাগরিবের নামাযের সময়ের ঘটনা। নিজে নিজেই বলতে থাকলেন, "রোযা খোল। মসজিদে নববীতে তারাবীর নামায পড়তে হবে। আজ খতমে কুরআন। জলদি করো। প্রথম কাতারে দাঁড়াতে হবে।"

কিছুক্ষণ পর আবার বলতে শুরু করলেন, "দেখ দেখ ! এত কষ্ট করে প্রথম কাতারে জায়গা পেলাম। এখন নাকি সরে চলে যেতে হবে পিছনে। ওরা বলছে চলে যাও, খাস মেহমান আসবে। ও ভাই, আমরা সবাই খাস মেহমান। এটা তো রাসূলুল্লাহ সঃ-এর মসজিদ। কারো মহল-বালাখানা নয়।"

আম্মাজান এসব কি বলছেন মনে করে আশেপাশে যারা দাঁড়িয়েছিল, তারা পেরেশান হয়ে পড়লো। কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম তার রূহ এখন স্থান-কাল-পাত্রের উর্ধ্বে আরোহণ করে ২৯ রমযান মসজিদে নববীর রাতকে স্মরণ করছে। এটাই ছিল এ ধরাপৃষ্ঠে আম্মার শেষ কথন। এরপর তিনি নীরব নিশ্চুপ হয়ে গেলেন চিরদিনের জন্য। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

কথিত আছে মাওলানা রুমীর (মৃত্যু : ১২৭৩ খৃ:) মৃত্যুশয্যায় একজন আলেমে দীন তার শুশ্রূষা করতে এসে বললেন, চিন্তা করবেন না, শীঘ্রই রোগমুক্তি হবে। জবাবে মাওলানা রুমী বললেন: "এখন রোগমুক্তি আপনার হোক, মাত্র চুল পরিমাণ বাকী আছে। অতঃপর নূর নূরে গিয়ে মিশে যাবে আর মাটি চলে যাবে মাটির নিচে।

আব্বাজান ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৯ সালে ইন্তেকাল করেন। আর আম্মাজান ২০০৩ সালের ৪ এপ্রিল শুক্রবার রাত ৮-২০ মিনিটে ইন্তেকাল করেন।

www.pathagar.com

পরদিন শনিবার বেলা ১১ টার সময় ৫-এ যায়িলদার পার্কে আব্বার পাশেই সমাহিত করা হয় আম্মাকে।

আম্মার একটি প্রিয় কবিতাংশ দিয়ে লেখাটি শেষ করছি

*সোয়েঙ্গে হাশর তক কে সবক দোশ হো চুকে*
*বারে আমানত গামে হাস্তী উতার কে*

অর্থ ঃ "ঘুমাবো আমি হাশর পর্যন্ত, চিন্তাহীন, শঙ্কাহীন।
দায়িত্বের বোঝা, আমানতের ভার তুলে দিয়ে।"

-ঃ সমাপ্ত ঃ-

www.pathagar.com

## আমাদের প্রকাশিত
## সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.-এর কিছু বই

* তাফহীমুল কুরআন (১-১৯ খণ্ড)
* ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা
* ইসলাম পরিচিতি
* ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ
* কুরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা
* আসমাউল হুসনা
* কুরআনের মহত্ব ও মর্যাদা
* ইসলামী অনুষ্ঠানের তাৎপর্য
* ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন
* ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা
* নির্বাচিত রচনাবলী (১-৩ খণ্ড)
* পত্রাবলী (১-২ খণ্ড)
* ইসলামের দৃষ্টিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ
* সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং
* ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ
* অর্থনৈতিক সমস্যার ইসলামী সমাধান
* ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূলনীতি
* পুঁজিবাদ বনাম ইসলাম
* একটি সত্যনিষ্ঠ দলের প্রয়োজন
* আজকের দুনিয়ায় ইসলাম
* ইসলামের শক্তির উৎস
* ইসলামী শিক্ষার মূলনীতি
* আদর্শ মানব
* নবী জীবনের বৈশিষ্ট্য
* মুসলিম বিশ্বে ইসলামী আন্দোলনের কর্মপন্থা
* ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ
* ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন
* ইসলাম ও ধর্মহীন গণতন্ত্র
* ভূমির মালিকানা বিধান
* তাকদীরের হাকীকত
* খতমে নবুয়াত
* মুরতাদের শাস্তি
* কাদীয়ানী সমস্যা

www.pathagar.com